উপন্যাস

মুক্তপুরুষ

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

সূচিপত্র

১-২. মানিকতলার মোড়ে 2
৩-৪. স্বর্ণ মেয়েটি 22
৫-৬. আর্টিস্ট কিংবা কবি 53
৭-৮. পুরুলিয়ার সেবা প্রতিষ্ঠান 74
৯-১০. হাওড়া পেরিয়ে 101

১-২. মানিকতলার মোড়ে

রাত্তির পৌনে দশটার সময় আমি নিজেকে আবিষ্কার করলাম মানিকতলার মোড়ে। আমার কপালে বেশ জ্বর এসেছে।

এক-একদিন সবই ভুল হয়ে যায়। বাড়ি থেকে বেরুবার সময় ছোটখাটো বাধা এসে পড়ে, অযথা দেরি হয়। হুড়োহুড়ি করতে গিয়ে পকেটে রুমাল কিংবা ঠিকঠাক পয়সা নিতে মনে থাকেনা। ন'নম্বর বাসে গেলেই সব চেয়ে সুবিধে, কিন্তু ন'নম্বর বাস সে-দিন কিছুতেই আসবে না। ট্রামের কন্ডাক্টর অনেক লোকের মধ্যে বেছে বেছে ঠিক আমাকেই বিনা কারণে অপমান করে। যার সঙ্গে দেখা করতে যাবার জন্য এত ব্যস্ততা, তার সঙ্গে দেখা হয় না। অতি ঘনিষ্ঠ বন্ধু উদাসীন ভাব দেখায়। রাস্তায় এক জন চেনা মানুষ চট করে মুখ ফিরিয়ে চলে যায় অন্য দিকে।

এক-একটা দিন এই রকম ভুলভাবে কাটে।

শুধু জ্বর নয়, আমার মাথার মধ্যে দপদপ করছে ব্যথা। চোখে ঘোর ঘোর লাগছে। ইচ্ছে করছে এই রাস্তার ওপরেই শুয়ে পড়ি। বাতাস বইছে বেশ। কিন্তু সে-বাতাস এমন গরম যেন তার আঁচে ঝলসে যাচ্ছে আমার গা।

হঠাৎ আমি মনে মনে বলে উঠলাম, সাত্যকি বসুমল্লিক। নামটা মনে পড়ছিল না...হুঁ। তোমাকে আমি দেখে নেব এক দিন।

একটা দোতলা বাস আসছে। নিশ্চয়ই এটা আমার নয়। আমার জন্য আজ কিছু ঠিকঠাক আসবে না। তবু দু'পা এগিয়ে গেলাম। বাসটা একদম খালি, দরজায় দাঁড়িয়ে এক জন হাত নেড়ে বলছে, যাবে না, যাবেনা।

যে যাবে না যাবেনা বলে, সে-ও কিন্তু কোথাও যায়।

আমার মনে হল, বাসের দরজার ওই লোকটা ঠিক আমার দিকেই আঙুল তুলে বলছে, নেবনা। তোমাকে নেবনা।

এই যদি আমার বদলে সাত্যকি বসুমল্লিক এখানে থাকত, তাহলে ওই লোকটাই হাত জোড় করে বিগলিত গলায় বলত, আসুন স্যার, উঠে আসুন।

এই অবস্থাতেও আমার একটু হাসি পেল। সাত্যকি বসুমল্লিকের মতো মানুষ এই রকম রাত্তিরে দোতলা বাসে চাপতে যাবেই-বা কেন?

বিড় বিড় করে বললাম, ওহে নীললোহিতচন্দর, এখন কী করবে? মনে তো হচ্ছে, ট্রাম-বাসের কিছু একটা গণ্ডগোল হয়েছে। আজ তো হবেই, জানা কথা। এখন বাড়ি ফিরবে কী করে? নাকি আজ ফুটপাথেই শুয়ে রাতটা কাটিয়ে দেবে?

পাশেই এক জন লোক দাঁড়িয়ে, সে আমার দিকে বেশ একটা খটকাপূর্ণ দৃষ্টি দিল। আমার স্বগতোক্তিটা বেশ জোরেই হয়ে গেছে? যাক, আমি গ্রাহ্য করি না।

সাত্যকি বসুমল্লিক এমনই যথার্থ ধরনের মানুষ যে, আমার ধারণা, কোনও দিন স্নান করার সময় তার হাত থেকে সাবান মাটিতে পড়ে যায় না। রাস্তায় কোনও দিন সাত্যকি বসুমল্লিকের চটির স্ট্র্যাপ ছিঁড়ে যায়নি। পাজামা পরার সময় যদি দেখা যায় এক দিকের দড়ি অনেকখানি ভিতরে ঢুকে আছে, তাহলে বেশির ভাগ মানুষকেই কিছুক্ষণের জন্য ব্যক্তিত্বহারা হতে হয়। সাত্যকি বসুমল্লিক কখনও সেই রকম অবস্থায় পড়েননি। একজন নিখুঁত ঝকঝকে মানুষ। সদ্য মহাভারত পড়ার জন্য আমার আরও মনে হয়, সাত্যকি নামের লোকদের বাল্যস্মৃতি থাকে না।

আমিহঠাৎ আমার বাসস্টপ-প্রতিবেশির দিকে ফিরে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি সাত্যকি বসুমল্লিককে চেনেন?

লোকটি বুঝতে না পেরে বলল, কী বলছেন? আমাকে বলছেন?

আজ কি ট্রাম-বাসের কোনও গোলমাল হয়েছে?

কী জানি!

লোকটি আমার পাশ ছেড়ে একটু দূরে চলে গেল। আমাকে বোধহয় নেশাখোর-টোর ভেবেছে। আমার এখন জ্বরের নেশা।

সারা দিন যে কোথায় কোথায় ঘুরেছি, কী করেছি, কিছুই মনে পড়ছে না। কিন্তু সাত্যকি বসুমল্লিকের কথা এত মনে পড়ছে কেন এখন? ফর্সা দোহারা চেহারা, খাঁটি আর্যবংশদ্ভূত নাক। ভুরু দুটি যেন কাজল দিয়ে আঁকা।

সাত্যকি বসুমল্লিক যে-বৃত্তে মানুষ তার থেকে আমার বৃত্ত অনেক দূরে। আমাদের মধ্যে কোনও যোগসূত্র স্থাপিত হবার কথা নয়। তবু একটা উল্কা যেমন চলে আসে কোন গ্রহের কাছে, সেই রকম একটা কিছু হয়েছিল। দেখা হয়েছিল নেতারহাটে ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের বাংলোতে গত মাসে।

প্রবাসে এক ধরনের ঝটিতি ঘনিষ্ঠতা হয়। তবু সে রকম কিছুও হবার কথা ছিল না, এক বাংলোতে কত রকম মানুষ যাবে, তাছাড়া আমি একটু একচোরা টাইপের। কিন্তু একটা পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল। আমি তখন ছিলাম সেখানে একলা একখানা ঘর নিয়ে। কেন গিয়েছিলাম নেতারহাটে? কেনই বা যাবনা, নেতারহাট কি কারুর বাবার সম্পত্তি।

বিকেল থেকেই ঝড় বৃষ্টি শুরু হয়েছিল, তারই মুখে সন্ধের মুখে একটা স্টেশন ওয়াগন নিয়ে সাত্যকি বসুমল্লিক সেখানে এসে পৌঁছলেন। সঙ্গের চার পাঁচ জন নারী পুরুষ শিশু। ওদের দু'টি ঘর চাই। সে-রকম বুকিং-ও ওদের ছিল। তা তো থাকবেই, এই সব লোকেরা তো ঝুঁকি নেয় না কখনও। আমি আজ পর্যন্ত আগে থেকে বাংলো বুক করে কোথাও যাইনি। এমনি গিয়ে হাজির হই, তারপর চৌকিদারকে বলেকয়ে একটা কিছু ব্যবস্থা হয়ে যায়। ঘর না পাওয়া গেলে বারান্দায় শুয়ে থাকতেই বা আপত্তি কী?

এই অবস্থায় সাত্যকি বসুমল্লিক তার ব্যক্তিত্ব দেখিয়ে আমার ঘর থেকে বার করে দিতে পারতেন। সেটাই স্বাভাবিক ছিল, তাহলে আমি ব্যাপারটাকে একটা চ্যালেঞ্জ হিসেবে গ্রহণ করতাম। আর কিছু না পারি, চার পাঁচখানা বিদ্রূপের দৃষ্টি তো ছুঁড়ে দিতে পারতাম লোকটার দিকে। কিন্তু অ্যারিস্টোক্র্যাসির যত দোষই থাক, এক ধরনের ভদ্রতা তারা শৌখিন জামাকাপড়ের মতো প্রতিটি ব্যবহারের গায়ে মুড়ে রাখে। অত্যন্ত পম্পাস গলায় তিনি বলেছিলেন, না না, এই ঝড়-বৃষ্টির মধ্যে ভদ্রলোক যাবেন কোথায়? আমরাই কষ্ট করে থাকি। তবে উনি যদি অনুমতি করেন, ওর ঘরে তো দুটো খাট আছে, তার একটাতে আমাদের দু'জন শুতে পারে।

শুধু তাই নয়, পরের দিনও সাত্যকি বসুমল্লিক আমাকে স্থান ত্যাগ করতে দিলেন না। আবার সেই কৃত্রিম উদার গলায় বললেন, আরে, আপনি চলে যাবেন কেন? আমরা এসে পড়ে আপনার কোনও অসুবিধে ঘটালাম? আপনি থেকে গেলে আমরা খুবই খুশি হব, গল্প-টল্প করা যাবে।

তিন দিন ছিলেন এক সঙ্গে। মাঝে মাঝে কথা হয়েছে, আমি সাত্যকি বসুমল্লিকের ব্যবহারে সামান্যতম খুঁতও পাইনি। তবুও অদৃশ্য ভাবে উনি যে সব সময় আমার পিঠ চাপড়ে দিচ্ছেন, সেটা ঠিকই টের পেতাম। ওঁর সঙ্গের মহিলারা কেউ একটাও কথা বলেননি আমার সঙ্গে। মেয়েরা এক নজরেই বুঝে যায়, কে হেলাফেলার যোগ্য।

সাত্যকি বসুমল্লিক বার বার বলেছিলেন কলকাতায় ফিরে ওঁর সঙ্গে দেখা করতে। ঠিক আমার মতো এক জন ছেলেকেই নাকি উনি খুঁজছিলেন। তিনটি কোম্পানির ডিরেক্টর হলেও উনি ঠিকানা দিয়েছিলেন বাড়ির। রেইনি পার্কে বসুমল্লিক হাউস। গত বুধবার ছিল অ্যাপয়েন্টমেন্ট। বলাই বাহুল্য, আমি যাইনি। কেউ কেউ উপকার করার প্রস্তাব দিয়ে আনন্দ পেতে চায়। আমি উপকার প্রত্যাখ্যান করে আনন্দ পাই।

যদি কোনও দিন রেইনি পার্কের বসুমল্লিক হাউসে আগুন লেগে যায়, আমি সেই আগুনের আঁচে একটা কচি ভুট্টা পুড়িয়ে খাব।

এ-সব বাজে কথা! পলাতক মানুষের গাঢ় সন্ধ্যার প্রলাপ-স্বপ্ন।

কিন্তু মানিকতলার মোড়ে বাসস্টপের দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমি শুধু শুধু সাত্যকি বসুমল্লিকের কথা ভেবে মরছি কেন? আমাকে বাড়ি ফিরতে হবে না? লোকটির চেহারা যতবার চোখের সামনে ভেসে উঠছে, ততই রাগ বাড়ছে। অথচ লোকটি আমার সঙ্গে প্রত্যক্ষ ভাবে এক বিন্দু খারাপ ব্যবহার করেনি। তাহলেও সাত্যকি বসুমল্লিককে যদি এখন কাছাকাছি পেতাম, ওর মসৃণ গালে একখানা চড় কষিয়ে দিতাম।

নাঃ ট্রাম-বাসের নিশ্চয়ই কিছু বড় রকমের অসদ্ভাব হয়েছে আজ। হয়তো শিয়ালদা বা শ্যামবাজারে গুলি চলেছে। একটা ট্যাক্সি এসে থামতেই হুড়মুড় করে অনেক লোক ছুটে গেল সে-দিকে। ওই রকম ভিড়ের মধ্যে ধাক্কাধাক্কি করে ট্যাক্সি চড়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তাছাড়া আমার পকেটে আছে শুধু কিছু খুচরো পয়সা, সব মিলিয়ে এক টাকা চল্লিশ, অনেক বার গুনে দেখেছি। এখন মওকা বুঝে শেয়ারের ট্যাক্সিতেও তিন-চার টাকা চাইবে। মানুষ বিপদে পড়লে মানুষই তার বেশি সুযোগ নেয়।

এরপর টেম্পো আসবে, ভ্যান, লরি, ঠ্যালাগাড়ি করেও মানুষ ফিরবে। অনেক লোক জমে গেছে। যদি কেউ অসুস্থ হয়ে পড়ে, সে কী করে বাড়ি যাবে?

আমি উবু হয়ে বসে ফুটপাথের ধার ঘেঁষে বমি করলাম। আমার কাছের লোকেরা দূরে সরে গেল। কেউ একটা প্রশ্নও করল না আমাকে। এখন মাথা ঠাণ্ডা রাখতে হবে। জ্বর খুব ভাল জিনিস, কিন্তু জ্বরের সঙ্গে বমি খুব খারাপ অসুখ না? কলেরা? আমার বরাবর ধারণা ছিল, প্রকৃত ভদ্রলোকের কখনও কলেরা হয় না। আজ কি কারুর সঙ্গে অভদ্রতা করেছি? সে-রকম কিছু মনে পড়ল না। শুধু সাত্যকি বসুমল্লিককে বিনা দোষে থাপ্পড় কষাতে চেয়েছিলাম, তা-ও মনে মনে।

উলটো দিকের ফুটপাথে একটা টিউবওয়েল আছে। ধীরেসুস্থে সে-দিকে হেঁটে গিয়ে মুখ ধুয়ে নিলাম। এক-এক সময় বড় অন্যায় আরদার করতে ইচ্ছে করে। যেমন, এখন আমার ইচ্ছে হচ্ছে, কেউ যদি আমার জন্য টিউবওয়েল পাম্প করে দিত। এক হাতে

পাম্প করে আর এক হাতে মুখ ধুতে বড্ড কষ্ট হচ্ছে। এলিয়ে পড়তে চাইছে শরীরটা। এ কী হল আমার!

কলকাতার রাস্তা যারা নোংরা করে, আমি আজ তাদের মধ্যে এক জন। এরপর ফুটপাথে শুয়ে থাকার তো আমার ন্যায্য অধিকার আছে। কিন্তু তার আগে ওষুধ খেতে হবে। জ্বরের সঙ্গে বমি, এবার আবার বেশ পেটব্যথা করছে। না না, এখন ইয়ার্কির সময় নয়, বেশ গুরুতর ব্যাপার, পট করে মরে যাবার কোনও মানে হয় না।

ঝড়ের মতো একটা বাস এসে থামল। হই হই রই রই করে উঠল একদল মানুষ। তাদের সঙ্গে আমিও বাসের দরজার দিকে ছুটতে যাচ্ছিলাম, হঠাৎ মনে হল, এটা তো উলটো দিকে যাবে। এটাই তো স্বাভাবিক, আজ আমার জন্য কোনও কিছুই ঠিকঠাক হবে না। কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে দেবার জন্যই এই বাসটা এসেছে।

কিন্তু এটা সত্যিই কি উলটো দিক? মানিকতলা মোড়ের কোন দিকে আমি দাঁড়িয়ে আছি? কোন দিকে শ্যামবাজার, কোন দিকে শেয়ালদা? সব গুলিয়ে যাচ্ছে। রাস্তার আলো এত কম কেন? মানিকতলা বাজারটা কোথায় গেল?

মাথা ঠাণ্ডা রাখতে হবে, মাথা ঠাণ্ডা রাখতে হবে।

আমার দিক ভুল হচ্ছে, এটা বিকারের লক্ষণ। আর এই অবস্থায় বাড়ি ফেরার চেষ্টা করে লাভ নেই। কাছাকাছি চেনাশুনো কারুর বাড়িতে... কে থাকে কাছাকাছি? কারবালা ট্যাঙ্ক লেনে দিলীপ দত্ত, হ্যাঁ, দিলীপের কাছে গেলে...কিন্তু কী যেন, কী যেন... ওঃ। ঠিক তো, দিলীপরা এখন আর কারবালা ট্যাঙ্ক লেনে থাকে না, সল্টলেকে বাড়ি করেছে। বিবেকান্দ রোডে ডাক্তার সলিল পাঁজা... এক দিন নেমন্তন্ন খেতে গিয়েছিলাম... তিনি আমাকে চিনতে পারবেন? মাত্র এক দিন দেখা... তাছাড়া এই অবস্থায়...। রামদুলাল সরকার স্ট্রিটে আমার এক মাস্টারমশাই, ...খুব ভাল লোক, কিন্তু রামদুলাল সরকার স্ট্রিট বেশ দূরে, অতটা কি হেঁটে যেতে পারব?

হঠাৎ মাথাটা পরিষ্কার হয়ে গেল। আমি কি একটা গাধা, আমহার্মস্ট্রিটের মুখেই তো নিলয়দার বাড়ি, সেটা এতক্ষণ মনে পড়েনি? নিলয়দা প্রায়ই কলকাতায় থাকে না অবশ্য, কিন্তু রূপাবউদিও আমার সঙ্গে যথেষ্ট ভাল ব্যবহার করে। আগে ঠিক করে নেওয়া যাক, আমহার্স্ট স্ট্রিটটা কোন দিকে?

কয়েক পা হাঁটার পরেই আমি দৌড়াতে শুরু করলাম। সমস্ত অনুভূতিবোধ এমন তীব্র হয়ে গেছে যে নিলয়দার বাড়ি চিনতে একটুও অসুবিধে হল না। এক তলাতেই বসবার ঘর। আলো জ্বলছে। একটু ঠেলতেই দরজাটা খুলে গেল, কেউ নেই ভেতরে, কেমন যেন খাঁ-খাঁ করছে ঘরটা।

ভেতর দিকে একটা ছোট উঠোন, তার দু'পাশে বারান্দা। সেই দু'দিকের বারান্দায় মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে নিলয়দা আর রূপাবউদি, উত্তেজিত ভাবে কিছু কথা বলছিল বোধহয়, আমি উঁকি মারতেই চিত্রার্পিত। আমাকে দেখার পরও বেশ কয়েকটা মুহূর্ত কেটে গেল, ওরা কোনও কথা বলল না।

গরজ আমারই বেশি। আমি একটু এগিয়ে গিয়ে বললাম, নিলয়দা, আমি হঠাৎ এসে পড়লাম একটু...।

অপ্রত্যাশিত রূঢ়তার সঙ্গে নিলয়দা বলল, তা তো দেখতেই পাচ্ছি!

অপ্রত্যাশিত হলেও খুব একটা আশ্চর্য হবার কিছু নেই। আজ তো সারা দিন এই রকমই চলছে। একটা সম্পূর্ণ ভুল দিন। কিন্তু আমি যে আর পারছি না।

নিলয়দা আমার খুব শরীর খারাপ লাগছে, খুব জ্বর রাস্তায় বমি করলাম, বাড়ি ফিরতে পারিনি, তাই তোমার এখানে চলে এলাম। তোমার চেনা কোনও ডাক্তার আছে?

মঞ্চাভিনেতার মতো অত্যন্ত জোরে হা-হা শব্দে হেসে উঠল নিলয়দা। তারপর বলল, এ-দিকে আমি একটা পাগলকে নিয়ে কী করব তার ঠিক নেই, তার ওপর আর এক জন

অসুস্থ রুগী এসে হাজির হলেন। আমার ভাগ্যটাই এই রকম, দেখলে তো রূপা! হা-হা-হা!

এখন হাস্য পরিহাসে যোগ দেবার মতো অবস্থা আমার নেই। আমি কাতরভাবে বললাম, এক তলার বাথরুমটা কোন দিকে বউদি?

বউদি আঙুলটা তুললেই আমি খ্যাপা মোষের মতো সোজা ঢুকে গেলাম।

.

০২.

বিকেলবেলা লায়নস্ রেঞ্জে ফুটপাথের দোকান থেকে টোস্ট আর ঘুগনি খেয়েছিলাম। ঘুগনির স্বাদটা তখনই যেন কেমন কেমন লেগেছিল, কিমাটা ইঁদুরের মাংসের ছাঁটের মতো, যদিও ইঁদুরের মাংস আমি কখনও খাইনি, কিন্তু ওই রকম হবার কথা। সেই ঘুগনি খেয়েই আমার ফুড পয়জনিং।

সারা রাত ভাল করে ঘুমোত পারলাম না, সকালবেলা আমার অবস্থা রীতিমতো কাহিল। গলার আওয়াজ চিঁ-চিঁ হয়ে গেছে।

ডাক্তার ডাকা হয়নি, নিলয়দা নিজেই দিয়েছে ওষুধ। রূপাবউদির বাবা ছিলেন একজন নামকরা ডাক্তার, সেই সুবাদে রূপাবউদিরও ওষুধপত্র সম্পর্কে জোর দিয়ে কথা বলার অধিকার আছে। যাই হোক, ন'টার সময় চায়ের কাপে সভয়ে চুমুক দিতে দেখলাম চা-টা বেশ ভালই লাগছে। তাহলে এ-যাত্রা আর বোধহয় আমার মরে যাবার চান্স নেই।

তখন ফিরে এল অভিমানবোধ। কাল রাত্তিরে নিলয়দা আমাকে দেখে কিংবা অসুখের কথা শুনে প্রথমে ও-রকম হেসে উঠলেন কেন? নিলয়দা আমাকে দেখে বিরক্ত হয়েছিল? অথচ নিলয়দার সঙ্গে আমার সে-রকম সম্পর্ক নয়। নিলয়দার সঙ্গে কতবার কত জায়গায়

বেড়াতে গেছি, একবার একটা ছোট্ট খাটিয়াতে দুজনে ঠাসাঠাসি করে শুয়ে কাটিয়েছি সারা রাত।

অবশ্য রাত্তিরে যত্ন করেছে নিলয়দা আর রূপাবউদি। একবার ঘরের মধ্যেই বমি করে ফেলেছিলাম, নিলয়দা আমার মুখমুছিয়ে দিয়েছিল। এটা নিলয়দার ছেলে পাপুন-এর ঘর। দেয়ালে একটা বেশ বড় করে ব্রুস লি'র পোস্টার ছবি। আর একটা ছবি কার চিনতে পারলাম না।

রূপাবউদি এসে জিজ্ঞেস করল, এখন কেমন লাগছে? উঠতে পারবে? পাপুন স্কুলে যাবে, ওর বই-টই নেবে, অবশ্য তোমার অসুবিধে হলে এখানেই শুয়ে থাকো।

আমি মিন মিন করে বললাম, না না, বউদি, আমি এবারে বাড়ি যাব। বাড়িতে কোনও খবর দেওয়া হয়নি।

এক তলায় কে যেন বিকট গলায় চিৎকার কবে উঠল, অত সোজা নয়। আমাকে বোঝানো অত সোজা নয়। আমার তিনটে চোখ আছে।

আমি চমকে উঠলাম। নিলয়দার গলার আওয়াজ তো নয়। নিলয়দা খুব নম্র গলায় কথা বলেন। তাহলে কে চেঁচাচ্ছে? আমি বউদির চোখের দিকে তাকালাম।

বউদি ও-দিকে মন না দিয়ে বলল, বাড়িতে খবর দাওনি, তাই তো, তোমার মা খুব চিন্তা করছেন নিশ্চয়ই।

আমি আস্তে আস্তে উঠে বসে বললাম, মা এখানে নেই। আর কেউ বিশেষ চিন্তা করবে না। ভাববে, আমি বাইরে কোথাও চলে গেছি।

রূপাবউদি, তোমাদের অনেক কষ্ট দিয়েছি কাল রাত্তিরে।

রূপাবউদি বিচিত্র ভাবে একটু হেসে বলল, আমি প্রথমে ভেবেছিলাম, তুমি বুঝি খুব মদ খেয়েছ। তারপরে বুঝলাম... বেশ খানিকটা চিন্তায় ফেলে দিয়েছিলে। অত বমি করেছ বলেই বেঁচে গেলে।

নিলয়দা কি বেরিয়ে গেছেন?

না। সিংহের খাঁচায় ঢুকে এখন সার্কাসের খেলা দেখাচ্ছে। তুমি তাহলে উঠে পড়ো, আমি বিছানা তুলব।

তোমারও তো আপিস আছে, বউদি?

আছে তো, কিন্তু যাব কী করে? বাড়িতে এই সব কাণ্ড!

আমি পরে আছি প্যান্ট আর গেঞ্জি। জামাটা কখন কে খুলে দিয়েছে, খেয়াল নেই।

উঠে দাঁড়িয়ে আমি বললাম, আমার একটা জরুরি কাজ আছে, মনে ছিল না। এক্ষুনি যেতে হবে। বউদি, আমার জামাটা?

সেটা খুব নোংরা হয়ে গেছে। ও পরে বাড়ি যেতে পারবে না। তুমি বরং নিচে গিয়ে বসো একটু, তোমার দাদার একটা জামা দিচ্ছি।

নিচ থেকে আবার সেই চিৎকার শুনতে পেলাম, অত সোজা নয়, আমার তিনটে চোখ আছে। আমি কে তুমি জানো? হায়, মাধুরী।

এবারে আমি জিজ্ঞেস করলাম, নিচে কে চেঁচাচ্ছে, বউদি?

ওই যে বললাম, সিংহের খাঁচা? সেই সিংহ! তোমার নিলয়দার নতুন খেয়াল। এবারেও ও আমাকে মারবে।

রূপাবউদির মুখে এরকম হেঁয়ালি ধরনের কথাবার্তা আমি আগে কখনও শুনিনি। রূপাবউদি বরং বেশ খটখটে ধরনের মহিলা, মানুষটা খারাপ নয়। কিন্তু কথাবার্তা বলে সোজাসুজি চাছাছোলা ভাষায়। রূপাবউদি প্রায় আমার সমান লম্বা, সেই জন্য একটা অতিরিক্ত ব্যক্তিত্ব আছে।

আমার চটিটা নিশ্চয়ই নিচে পড়ে আছে। খালি পায়ে সিঁড়ির রেলিং ধরে নামতে লাগলাম। মাথাটা বেশ টনটন করছে এখনও। এক দিনের অসুখে অতটা কাবু হইনি কখনও আগে।

বারান্দার কোণে একটা ঘরের দরজা বন্ধ। তার পাশের জানলায় দাঁড়িয়ে পাপুন উঁকি মারছে ঘরের মধ্যে।

আমার পায়ের শব্দ শুনে পাপুন মুখ ফিরিয়ে ঝকঝকে একটা কৌতুকের হাসি দিল। তারপর জানলা থেকে নেমে এসে বলল, জানো নীলুকাকা, পাগলটা কিছুতেই খাচ্ছে না।

কোন পাগলটা?

বাবা যাকে রাস্তা থেকে ধরে এনেছে।

এইবার আমার মনে পড়ল, কাল রাত্তিরে নিলয়দা পাগল সম্পর্কে কী যেন বলেছিল।

রাস্তা থেকে একটা পাগল ধরে আনা নিলয়দার পক্ষে আশ্চর্য কিছুনা। নিলয়দার এ-রকমই সব অদ্ভুত খেয়াল।

গত বছর শীতকালে নিলয়দার সঙ্গে আমি কাঁকড়াঝোড় জঙ্গলে একটানা দশ দিন ধরে ঘুরেছি। একটা বুড়ো নেকড়ে বাঘের সন্ধানে। একটা ইংরেজি কাগজে খবর ছাপা হয়েছিল যে, কাঁকড়াঝোড় জঙ্গলে নাকি একটি নেকড়ে বাঘের দেখা পাওয়া গেছে। বাঘটি খুব বুড়ো, মাঝে মাঝে লোকালয়ের কাছাকাছি চলে আসে। দুদিন বাদেই অবশ্য প্রতিবাদ ছাপা হয়েছিল সেই খবরের। একজন লিখেছিল যে, নেকড়ে বাঘ বা উলফ বা

□□□□□ □□□□□ নাকি উত্তর-পূর্ব ভারত থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে অনেক দিন। পশ্চিমবাংলায় নেকড়ে বাঘ এখন কারুর পক্ষে দেখতে পাওয়া অসম্ভব।

তবু প্রথম খবরটি পড়েই উদ্দীপ্ত হয়ে উঠেছিল নিলয়দা। আমাকে বলেছিল, নীলু, যাবি নাকি? চল না, বাঘটাকে খুঁজে আসি, যদি দেখা পেয়ে যাই, ছবি তুলে আনব। একটা দারুণ ব্যাপার হবে।

কোনও জঙ্গলে একটা নেকড়ে বাঘ আছে কি নেই, তাতে আমার কিছু যায় আসে না। নেকড়ে বাঘ লুপ্ত হতে হতে একটা যদি এখনও থেকেই যায়, তাহলেই বা তাকে অযথা বিরক্ত করার কী দরকার? বরং তার কাছাকাছি না যাওয়াই ভাল। একদম একলা হয়ে পড়ায় সেই নেকড়েটার মেজাজ বেশ খারাপ থাকাই স্বাভাবিক।

কিন্তু জঙ্গলে বেড়াতে যাওয়ার যে-কোনও একটা উপলক্ষ পেলেই আমি নেচে উঠি। নিলয়দাকে আমি তাল দিয়ে বলেছিলাম, চলুন, চলুন, অন্য কেউ যাবার আগে আমরা গিয়ে নেকড়েটাকে ধরে ফেলি।

রূপাবউদি ঠাট্টা করে বলেছিলেন, ধরতে পারলে কলকাতায় নিয়ে এসো। আমাদের বাড়িতে পুষব। নেকড়ে বাঘকে তো প্রায় অ্যালসেশিয়ানের মতোই দেখতে।

সেই সূত্র ধরেই রূপাবউদি এবারে সিংহ ধরে আনার কথা বলছেন!

কাঁকড়াঝোড় জঙ্গলে আমরা শেষ পর্যন্ত নেকড়ে বাঘটার দেখা পাইনি বটে, কিন্তু ঘোরাঘুরি করতে হয়েছিল খুব। জঙ্গলের আদিবাসী, ফরেস্ট গার্ড, বিট অফিসার, বাংলোর চৌকিদার অনেকেই নাকি নেকড়েটাকে দেখেছে। বিট অফিসার বলেছিল যে, একদিন সন্ধেবেলা সে জিপে করে ফিরছিল গভীর জঙ্গলের মধ্য দিয়ে। জিপের পেছনে পেছনে একটা ধূসর রঙের প্রাণীকে সে অনেকক্ষণ দৌড়ে আসতে দেখেছিল, সেই প্রাণীটা নেকড়ে না হয়ে যায় না। জঙ্গলের সেই জায়গাটায় আমরা পর পর দু'দিন ভোর থেকে সন্ধে পর্যন্ত কাটিয়েছি। নিলয়দার দারুণ উৎসাহ, আমাকে চোখ বড় বড় করে বলেছিল, একদম

একলা একটা নেকড়ে, কোনও বন্ধু নেই, সঙ্গিনী নেই, সে কী করে বেঁচে আছে বল তো? মনে কর, পৃথিবীর মানুষের কোনও জাতির আর সবাই মরে গেল, শুধু এক জন বেঁচে রইল।

পাপুন বলল, জানো নীলুকাকু, ওই পাগলটা না মাকে কামড়ে দিতে এসেছিল।

আমি দ্রুত বসবার ঘরের দিকে চলে এলাম। জঙ্গলের বাঘ-ভাল্লুকের চেয়েও আমি পাগলদের বেশি ভয় পাই। হয়তো ছেলেবেলায় কোনও দুঃসহ অভিজ্ঞতা আমার মনের মধ্যে ছাপ ফেলে গেছে। পাগলদের চোখের দিকে তাকালেই আমার গা ছম ছম করে।

দুর্বল শরীরে কোনও অ্যাডভেঞ্চারের স্পৃহা জাগে না। নিলয়দা কোন শখে রাস্তা থেকে একটা পাগলকে ধরে এনেছে কে জানে! এখন আমার কেটে পড়া দরকার। নিলয়দার কাছ থেকে বিদায় নেবারও প্রয়োজন নেই।

পাপুন জিজ্ঞেস করল, তুমি কী খুঁজছ?

আমি বললাম, চটিটা খুঁজে পাচ্ছি না। এইখানেই কোথাও আছে। পাপুন, লক্ষ্মীছেলে, ওপরে গিয়ে মার কাছ থেকে একটা জামা চেয়ে আনবে?

তোমার জামা কী হল?

আমার জামাটা, ইয়ে, ভিজে গেছে। তোমার বাবার একটা জামা চেয়ে নিয়ে এসো।

তোমার জামাটা ভিজল কী করে?

ছোট ছেলে মেয়েদের কৌতূহল প্রবৃত্তি থাকা ভাল। যত বেশি কৌতূহলী হবে, তত জ্ঞান বাড়বে। কিন্তু এই মুহূর্তে পাপুনের জ্ঞান বৃদ্ধি করার কোনও ইচ্ছে আমার নেই।

একটু কড়া গলায় বললাম, বাথরুমে পড়ে গিয়েছিল। তুমি যাও পাপুন, মা'র কাছ থেকে চট করে একটা জামা নিয়ে এসো।

পাপুন ফিক করে হেসে ফেলে বলল, বাবার একটা জামা ওই পাগলটাকে দিয়েছে। তুমিও আর একটা জামা নেবে?

পাপুনকে অন্য দিন আমার কত ভাল লাগে। মাথার রেশমি নরম চুলে হাত বুলিয়ে আদর করি। এখন পাপুনের সঙ্গে আর আমার কথা বলতেই ইচ্ছে করল না।

মুখের মধ্যে জল জল ভাব হচ্ছে। আবার বমি আসবে নাকি? আমি প্রাণপণে একটা বমি প্রতিরোধ শক্তি তৈরি করে খুঁজতে লাগলাম চটি জোড়া।

পাপুন বলল, তোমার চটি কোথায় আছে, আমি জানি। বলব না, ব-ল-ব-না।

গেঞ্জি গায়ে খালি পায়ে বেরিয়ে গেলেই-বা ক্ষতি কী আছে? এ-দেশে শতকরা ঊনসত্তর জন লোক পায়ে কখনও জুতো পরেনা আর শতকরা তিয়াত্তর জন লোক কোনও দিন একটা গেঞ্জি পর্যন্ত গায়ে দেয়নি। আমার খুচরো পয়সাগুলোও শার্টের পকেটেই ছিল, রূপাবউদি তা কোথায় রেখেছে কে জানে! পকেটে একটা রুমাল ছাড়া আর কিছু নেই।

তবুও বেরিয়ে পড়ব ঠিক করতেই বাইরে দরজার সামনে এক রমণীমূর্তির আবির্ভাব হল। বছর পঁচিশ-ছাব্বিশ বয়স, বেশ উদ্ধত-যৌবনা, গায়ের শাড়িখানা যেন মাকড়সার জাল দিয়ে তৈরি। আমি চিনি এই মেয়েটিকে, রূপাবউদির ছোট বোন, এ বাড়িতেই দেখেছি এক দিন, এর নাম স্বর্ণ।

মেয়েটিরও আমাকে চেনা উচিত, কিন্তু সে-রকম কোনও ভাবই দেখাল না। বরং থমকে গিয়ে আড়ষ্ট হয়ে গেল। আমার চোখের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে যেন মুখখানা শুকিয়ে যেতে লাগল ওর। আমাকে দেখে ভয় পেয়েছে?

কাঁপা কাঁপা গলায় জিজ্ঞেস করল, এই পাপুন, দিদি কোথায়?

আমার মেজাজ খুবই খারাপ হয়ে গেছে, আর এক মুহূর্তও এখানে থাকতে ইচ্ছে করছে না। আমি দরজার দিকে এগোতেই স্বর্ণ 'ও মাগো' বলে চিৎকার করে উঠে অদ্ভুত কায়দায় একটা দৌড় লাগাল, একবার আমার বাঁ-পাশ, একবার আমার ডান পাশ ঘুরে উলটো দিকে চলে গিয়ে পাপুনকে জড়িয়ে ধরল।

এরকম অবস্থায় চলে যাওয়া যায় না। আমি মুখ ঘুরিয়ে আহত ভাবে স্বর্ণর দিকে তাকালাম।

পাপুন খিল খিল করে হেসে উঠে বলল, ও পাগল নয়! ও পাগল নয়! কী মজা! ছোটমাসি, ও তো নীলুকাকু! পাগলটা ভেতরে আছে!

এই কথা শুনেই স্বর্ণ আধুনিকা-সুলভ দাম্ভিক ভাবে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে ময়না পাখির মতো তীক্ষ্ণ সুমিষ্ট স্বরে বলল, আপনি খালি গায়ে কেন? তাই আমি বুঝতে পারিনি। মাথার চুল উস্কোখুস্কো, চোখ দুটো কেমন কেমন।

এই সময় রূপাবউদি একটা জামা নিয়ে উপস্থিত হল। আমাকে বাইরের দরজার কাছে দেখে বলল, এ কী, কোথায় যাচ্ছ? জামা এনেছি। পাপুন বলল, মা, জানো তো, ছোটমাসি না, হি-হি-হি!

স্বর্ণ জিজ্ঞেস করল, দিদি, নিলয়দা নাকি রাস্তা থেকে একটা পাগল ধরে নিয়ে এসেছে?

তুই কোথা থেকে শুনলি?

আমাকে জয়নন্দন বলল। ও দেখেছে, কাল বিকেলবেলা নিলয়দা একটা পাগলকে ধরে... রাস্তার লোকেরা পাগলটাকে মারছিল।

তোর বন্ধু জয়নন্দন তো আচ্ছা ছেলে! সে দেখেছে, তবু তোর নিলয়দাকে সাহায্য করতে আসেনি?

ভেতর থেকে জলদগম্ভীর স্বরে সেই পাগল চেঁচিয়ে উঠল, আমাকে কেউ চেনে না, আমিও কারুকে চিনি না। এই হল সোজা কথা।

হায়, মাধুরী!

গলার আওয়াজ শুনে মোটেই পাগল বলে মনে হয় না। যেন কেউ যাত্রার পার্ট করছে।

আমি রূপাবউদির কাছ থেকে জামাটা নিয়ে পরে ফেললাম। নিলয়দার হাওয়াই শার্ট আমার গায়ে বেশ ফিট করে। স্বর্ণ এসে পড়ে যে কাণ্ডটি করল, সেই উত্তেজনায় আমার বমি বমি ভাবটা কেটে গেছে। একে বলে প্রাকৃতিক চিকিৎসা। এখন চটি জোড়া ও খুচরো পয়সাগুলো পেলে আমি অনায়াসে চলে যেতে পারি।

বউদি, পাপুন আমার চটি লুকিয়ে রেখেছে, ওকে বার করে দিতে বলুন। আর আমার পকেটে কিছু পয়সা ছিল।

পয়সা ছিল? তা তো আমি জানি না। দেখো তো, বাথরুমে জামাটা রয়েছে। ক' টাকা ছিল? সব ভিজে গেছে নিশ্চয়ই।

বাথরুমের দিকে পা বাড়াতেই পাগলের ঘরের দরজা খুলে বেরিয়ে এল নিলয়দা। এক হাতে একটা বাটি, অন্য হাতে একটা বালতি। সেগুলো নামিয়ে রেখে দরজাটা বন্ধ করে হুড়কো টেনে দিল। তারপর বলল, নীলু, বডি ফিট হয়ে গেছে? কাল রাত্তিরে খুব ঝামেলা করেছিলি, উফ। শোন, তোর সঙ্গে আমার কাজের কথা আছে।

বাথরুমে আমি চটি আর জামাটা পেয়ে গেলাম। জামাটা বমিতে মাখামাখি। ও জামা কেউ কাচবে না, ফেলেই দিতে হবে। নিজের বমিতেও হাত দিতে ঘেন্না লাগে, তবু পয়সা বলে কথা, কোনওক্রমে সেই জামার বুকপকেট থেকে পয়সাগুলো বার করে ভাল করে জল দিয়ে ধুয়ে নিলাম।

বাইরে এসে বললাম, নিলয়দা, আমার বাড়িতে কোনও খবর দেওয়া হয়নি।

নিলয়দা বললেন, তোদের পাশের ফ্ল্যাটে একটা ফোন আছে না? আমার ফোনটা খারাপ, আমি অফিসে গিয়ে তোদের পাশের ফ্ল্যাটে ফোনে খবর দিয়ে দিচ্ছি।

শরীরটা এখনও পুরো ঠিক হয়নি, মাথা ঘুরছে, বাড়ি গিয়ে –।

এখানে শুয়ে থাক। বিশ্রাম নে। তোকে আমার আজকে খুব দরকার।

তুমি একটা পাগল ধরে এনেছ?

চুপ! শুনতে পাবে, পাগলকে কখনও পাগল বলতে নেই, ওরা ওই কথাটা ঠিক বুঝতে পারে।

আমাকে কী করতে হবে, নিলয়দা?

তুই আজকের দিনটা বাড়িতে থেকে ওকে পাহারা দিবি। অফিসে জরুরি কাজ আছে, আমার আজ না গেলেই নয়। কাল থেকে ছুটি নেব!

আমি পাগল পাহারা দেব?

আবার? বললাম না, ওই কথাটা উচ্চারণ করবি না! এখন থেকে বলবি রাস্তার ভদ্রলোক। উঃ, কাল রাত্তিরে কী ঝকমারি গেছে। এক দিকে ওকে সামলানন, তারপর আবার তুই এসে বমি-টমি শুরু করলি। সারা রাত ঘুমোতে পারিনি। শেষ পর্যন্ত তোকে আর ওকে, দু'জনকেই ঘুমের ওষুধ খাইয়ে দিলাম।

খুব দুঃখিত, নিলয়দা। তোমাকে আর বউদিকে খুব কষ্ট দিয়েছি, হঠাৎ এমন শরীরটা খারাপ হল। রাস্তার একটা দোকানের ঘুগনি খেয়ে– ।

রাস্তার দোকানে ঘুগনি খুব টেস্টফুল হয়। আমারও মাঝে মাঝে খেতে ইচ্ছে করে।

নিলয়দা, বলছিলাম কী, আজকের দিনটা যদি বাড়িতে ফিরে রেস্ট নিতে পারি– ।

শোন, ব্যাপারটা তোকে বুঝিয়ে বলছি।

বসবার ঘরে স্বর্ণ উচ্চহাস্য করে উঠল। রূপাবউদি বলল, তুই হাসছিস? আমার এই বাঁ-হাতের সব কটা আঙুল কামড়ে ধরেছিল।

দুই বোন বেরিয়ে এল উঠোনে।

রূপাবউদি বলল, আমার রান্নার লোকটা ছুটি নিয়েছে। একহাতে সামলাতে হচ্ছে সবকাজ, এর মধ্যে আবার বাড়িতে একটা বদ্ধ পাগল এনে হাজির করেছে!

নিলয়দা বলল, ছিঃ রূপা! ওই রকম চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে পাগল পাগল বলছ কেন? এক জন মানুষ, সে অসুস্থ।

রূপাবউদি বেশ কড়া গলায় ধমকে দিয়ে বলল, পাগলকে পাগল বলব না কি ছাগল বলব? তা-ও আবার ভায়োলেন্ট পাগল, আমাকে কামড়ে দিতে আসে!

বন্ধ ঘরের ভেতর থেকে চিৎকার ভেসে এল, আমি সব জানি, আমি সব বুঝি! আমার তিনটে চোখ।

রূপাবউদি তর্জনী তুলে বলল, ওকে তুমি এক্ষুনি বিদায় করে দাও! যথেষ্ট হয়েছে।

নিলয়দা বলল, শোনো রূপা, ও ঠিক তোমাকে কামড়ে দিতে চায়নি, মানে একটা মিসআন্ডারস্ট্যান্ডি হয়েছিল, অসুস্থ তো! এই যে নীলু কাল তোমার গায়ে বমি করে দিল, স্বাভাবিক অবস্থায় কি আর করত?

সীতার মতো আমার বলতে ইচ্ছে হল, মা ধরণী, দ্বিধা হও! কাল রাত্তিরে আমি এমন কাণ্ডও করেছি! রূপাবউদির সামনে আর কক্ষনও মুখ তুলে কথা বলা যাবেনা।

কিন্তু রূপাবউদি তক্ষুনি আমার গ্লানি কাটিয়ে দিল। বলল, নীলু আমাদের চেনা, তার এক দিন হঠাৎ অসুখ করেছে, সে-কথা আলাদা। আর একটা রাস্তার লোক, চিনি না, শুনি না, আমাদের সঙ্গে কোনও সম্পর্ক নেই।

বন্ধ ঘরের ভেতর থেকে ঠিক যেন এরই উত্তর ভেসে এল, আমাকেও কেউ চেনে না, আমিও কারুকে চিনি না। এই হল সোজা কথা! হায়, মাধুরী! কেউ কিছুই জানল না!

স্বর্ণ ফিস ফিস করে চোখের ইঙ্গিতে জিজ্ঞেস করল, নিলয়দা, একটু দেখব? কামড়ে দেবে?

পাপুন বলল, এসোনা, এসো, আমি জানলা দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছি!

নিলয়দা বলল, না না স্বর্ণ, জানলার কাছে যেও না। ও মেয়েদের সহ্য করতে পারে না।

তারপর আমাকে বলল, তুই একটু দেখ তো, নীলু! তোর চেনা কিংবা কোথাও আগে দেখেছিস কি না! আমার কিন্তু মুখটা খুব চেনা চেনা লাগে।

আমি খুব সন্তর্পণে জানলার কাছে গিয়ে উঁকি দিলাম। আমার পেছনে এসে দাঁড়ালো স্বর্ণ।

ঘরের মধ্যে খাটের ওপরে হাঁটু গেড়ে বসে আছে এক জন লোক। বেশ লম্বা চওড়া চেহারা, পঁয়তিরিশেক বয়স। পরনে একটা অতি নোংরা খাকি প্যান্ট, আর একটা পরিষ্কার পাঞ্জাবি, সেটা নিশ্চয়ই নিলয়দার। লোকটির মুখে খোঁচা দাড়ি, মাথার চুলে জট। লোকটি এক সময় বেশ সুপুরুষ ছিল। গালে, কপালে, অনেকগুলো ক্ষততে স্টিকিং প্লাস্টার লাগান।

আমাদের দিকে পেছন ফিরে বসেছিল লোকটি। হঠাৎ এক সময়ে মুখ ফিরিয়ে তাকাল। আমাকে নয়, স্বর্ণকে দেখতে পেয়েই যেন চোখ দুটো জ্বল জ্বল করে উঠল তার। হুঙ্কার দিয়ে বলল, অত সোজা নয়, আমার তিনটে চোখ আছে।

সঙ্গে সঙ্গে হুড়মুড়িয়ে সরে এলাম আমরা। না, এই লোকটিকে আমি আগে কোনও দিন দেখিনি!

৩-৪. স্বর্ণ মেয়েটি

স্বর্ণ মেয়েটি কিন্তু বেশ কাজের। পাপুনের স্কুলের দেরি হয়ে যাচ্ছিল বলে চটপট করে তৈরি করে দিল তাকে। রান্নার লোকটি অনুপস্থিত বলে রূপাবউদি দিশেহারা হয়ে পড়েছিল, স্বর্ণ বলল, আমি সব ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। নিলয়দা আর দেরি করতে পারছেন না, তাকে এক্ষুণি অফিসে যেতে হবে, সেখানেই দুপুরে কিছু খেয়ে নেবেন বলেছিলেন, স্বর্ণ বলল, দশ মিনিট বসুন না! একটু কিছু খেয়ে যাবেন, লুচি ভেজে দিচ্ছি। দিদি, তুই আলুভাজা কর, আমি ময়দা মেখে দিচ্ছি।

খেতে বসে নিলয়দা বলল, রূপা আজ অফিসে যাচ্ছনা তাহলে? তোমার তো ছুটি পাওনা আছে। নীলু রইল বাড়িতে, চিন্তার কিছু নেই।

রূপাবউদি বলল, পাগলটা যদি ঘর থেকে বেরুতে চায়, নীলু একাকী করবে? ও গায়ের জোরে পারবে?

একটা পাগলের সঙ্গে গায়ের জোরের প্রতিযোগিতায় নামতে হবে, এটা ভেবেই আমি শিউরে উঠলাম। নিলয়দা আমাকে এ কীরকম প্যাঁচে ফেলে দিল। কাল রাত্তিরে আমার বিপদের সময় নিলয়দা সাহায্য করেছে, আমার মুখ থেকে বমি মুছে দিয়েছে, সুতরাং এখন আমি অকৃতজ্ঞের মতো পালিয়ে যেতেও পারি না।

স্বর্ণ জিজ্ঞেস করল, নিলয়দা, তোমার হঠাৎ পাগল পোষার শখ হল কেন?

নিলয়দা বলল, ওকে একটু সারিয়ে সুরিয়ে তোর সঙ্গে বিয়ে দেব। তুই যেমন পাগলি, তোর সঙ্গে মানাবে!

না নিলয়দা, সিরিয়াসলি, তুমি রাস্তা থেকে পাগল ধরে আনলে কেন?

আমি বললাম, আমারও সেটা জানতে ইচ্ছে করছে। নিলয়দা, তুমি কিছু এক্সপেরিমেন্ট করতে চাও?

নিলয়দা মুখ তুলে অত্যন্ত বিস্ময়ের সঙ্গে বলল, এক্সপেরিমেন্ট মানে? একটা লোককে রাস্তার ছেলেরা পিটিয়ে মেরে ফেলছিল, আমি চোখের সামনে সেটা দেখব? তাকে বাঁচাবার চেষ্টা করবনা?

রাস্তার ছেলেরা ওকে মারছিল কেন?

তা আমি জানি না। আজকাল তো যেখানে সেখানে একদল লোক মিলে এক জন দুজন লোককে পিটিয়ে মেরে ফেলে। কাগজে পড়ো না? চোর, ডাকাত কিংবা ছেলেধরা বলে সন্দেহ হল, অমনি ব্যাস, কোনও কথা শোনার আগেই সবাই মারতে শুরু করল। এই লোকটি নাকি রাস্তার কোনও এক জন ভদ্রমহিলাকে তাড়া করেছিল। সত্যি-মিথ্যে জানি না।

তুমি গিয়ে আটকালে?

আর একটু দেরি হলে নির্ঘাৎ মেরেই ফেলত। রামমোহন লাইব্রেরির সামনে, তখন সন্ধে ছ'টা, রাস্তায় কত লোকজন, বাস-ট্রাম যাচ্ছে, তার মধ্যে এক দঙ্গল ছেলে মিলে একটি পাগলকে পিটিয়ে মেরে ফেলছে, কেউ আটকাচ্ছে না। অনেকে দূরে দাঁড়িয়ে মজা দেখছে। একেবারে লিঞ্চিং-এর দৃশ্য, এই টুয়েন্টিয়েথ সেঞ্চুরিতেও! আমি গিয়ে বাধা দিতেই সবাই হই হই করে উঠল। যেন আমাকেও মেরে বসবে আর কি!

রূপাবউদি বলল, মারতেও পারত। এই সব ব্যাপারে যে বাধা দিতে যায়, তাকেও লোকেরা ছাড়ে না।

নিলয়দা বলল, কয়েক জন আমাকে ধাক্কাধাক্কি করেছিল। বলে যে, ছেড়ে দিন, ওকে শেষ করে দেব! শালা, মেয়েছেলের গায়ে হাত তুলেছে। মেয়েদের কিছু ব্যাপার হলেই

পাড়ার সব ছেলেরা একেবারে বীরপুরুষ হয়ে ওঠে। তা-ও আবার কী, একটা মেয়ে না খেতে পেয়ে ভিক্ষে করুক, তার কোলের ছেলেটা ট্যাঁ ট্যাঁ করে কাঁদুক, কেউ ফিরেও তাকাবেনা। কিন্তু ভিখিরি মেয়েটার আঁচল ধরে যদি কেউ টান দেয়, অমনি পাড়ার নীতি-রক্ষকরা হই হই করে উঠবে।

স্বর্ণ বলল, এ তো জানিই। সব জায়গাতেই এই অবস্থা। কিন্তু... তা বলে তুমি একটা পাগলকে বাড়িতে নিয়ে আসবে? দিদি কী করে সামলাবে?

খাওয়া বন্ধ রেখে আহত ভাবে নিলয়দা বলল, তোমরা বলতে চাও, একটা লোককে সবাই মেরে ফেলছে, চোখের সামনে তা দেখেও আমি লোকটাকে সেখানে ফেলে রেখে চলে আসব? যারা এরকম করে, তারা কি মানুষ?

অনেক সরল প্রশ্নেরই কোনও উত্তর হয় না। এ-দেশে এরকম ঘটনা প্রায়ই ঘটে। লক্ষ মানুষ এসব দেখেও কোনও প্রতিবাদ করে না। আমি নিজেও তাদের মধ্যে একজন। এই সব লক্ষ লক্ষ লোককে মানুষ না বলে কী বলব? যারা মারে তারাও মানুষ, যারা দূর থেকে দেখে তারাও মানুষ, যে মরে সে-ও মানুষ!

হঠাৎ নিলয়দা উত্তেজিত হয়ে পড়েছিল, একটু সামলে নিয়ে বলল, ওই ছেলেগুলো আমাকে বলল, আপনি যে ওকে গার্ড দিচ্ছেন, আপনি ওর দায়িত্ব নেবেন? ও যদি আবার মেয়েছেলেদের তাড়া করে। আমি বললাম, দেখো, ও লোকটা তো অসুস্থ, ও তো সজ্ঞানে কিছু করে না। তা-ও ছেলেগুলো আমাকে তেড়ে তেড়ে বলতে লাগল, আপনি ওর দায়িত্ব নেবেন? বড্ড যে বড়ফট্টাই করছেন! তখন আমি বললাম, হ্যাঁ, আমি ওর দায়িত্ব নেব। আমি ওকে সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছি।

লোকটা আসতে রাজি হল তোমার সঙ্গে?

দেখো, পাগলেরও কিছুটা কিছুটা জ্ঞান তো থাকে! লোকটা মার খেয়ে রাস্তায় পড়ে গিয়েছিল, আর কয়েকটা লাঠির ঘা খেলে আর উঠতেই পারত না। আমি ওকে তুলে দাঁড়

করিয়ে বললাম, চলুন, আপনি আমার সঙ্গে চলুন। লোকটি সঙ্গে সঙ্গে আমার হাত জড়িয়ে ধরে এমন ব্যাকুল ভাবে আমার মুখের দিকে তাকাল, সেই চাউনিতে কী যে ছিল তোমাদের কী করে বোঝাব? আমার চোখে জল এসে গিয়েছিল। মানুষের ও-রকম চরম অসহায় দৃষ্টি আমি কখনও দেখিনি! ওকে নিয়ে একটা রিকশায় উঠলাম। ও সারাক্ষণ আমার হাতটা চেপে ধরে রইল।

ও নিজের নাম-টাম কিছু বলতে পারে না?

ও নিজে থেকে মাঝে মাঝে কথা বলে ওঠে। কিন্তু কোনও প্রশ্ন করলে উত্তর দেয় না। কথা শুনলে মনে হয়, লেখাপড়া জানত। কালকে বাড়িতে আসার পর প্রথম ঘণ্টা দু'এক কিন্তু বেশ শান্ত ছিল। তাই না রূপা?

রূপাবউদি বলল, আমার এই হাতটা ধরে টপ করে মুখে পুরে দিল। যদি আঙুলগুলো কামড়ে ছিঁড়ে নিত?

নিলয়দা বলল, সেই একটা আনফরচুনেট ব্যাপার। ওর গায়ের অনেকগুলো ইনজুরি হয়েছিল, রক্ত পড়ছিল, সব ধুয়ে-টুয়ে পরিষ্কার করে দিলাম। রূপাও আমাকে সাহায্য করছিল, হঠাৎ এক সময় রূপাকে কামড়ে দিতে গেল! তার পরেও দু'বার দাঁত খিঁচিয়ে তেড়ে গেছে। আমার মনে হয় মেয়েদের ব্যাপারে ওর কিছু গণ্ডগোল আছে। পাপুনকে কিন্তু কিছু বলেনি!

স্বর্ণ জিজ্ঞেস করল, এখন ওকে নিয়ে কী করবে?

নিলয়দা টেবিল ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, সেটা চিন্তা করে দেখছি। আজকের দিনটা যাক। নীলু রইল, তোমাদের কোনও ভয় নেই!

আমি বললাম, ইয়ে, মানে, নিলয়দা, বউদিরা বোধহয় আমার সম্পর্কে খুব একটা ভরসা পাচ্ছে না। ধরো যদি লোকটা দরজা খুলে বেরিয়ে আসতে চায়, তখন কী করব?

দরজা তো বাইরে থেকে বন্ধ আছে।

যদি বেরুতে চায়? দরজা ধাক্কাধাক্কি করে? দরজা তো ভেঙে ফেলতেও পারে?

আরে না, সে-রকম ভায়োলেন্ট পাগল নয়। ধমক দিলে কথা শোনে। আমার তো মনে হয়, ও তোমার কথাও শুনবে।

নিলয়দা, আমার ব্যক্তিত্বের ওপর তোমার অগাধ বিশ্বাস থাকতে পারে, কিন্তু আমার নিজেরই সে-রকম বিশ্বাস নেই। ধরো ওর যদি বাথরুম পায়, কিংবা রাস্তায় বেরিয়ে যেতে চায়।

সকালবেলা আমি ওকে বাথরুম দেখিয়ে দিয়েছি। ও নিজেই বাথরুমে গেছে। সেটুকু সেন্স আছে।

রূপাবউদি বলল, আমি আর কোনও দিন ওই নিচের বাথরুমে ঢুকছি না।

নিলয়দা বলল, জমাদার এসে পরিষ্কার করে দিয়ে গেছে। আচ্ছা, একটা পরীক্ষা করা যাক। আমি থাকতে থাকতেই নীলু, তুই একবার ওর ঘরে গিয়ে ঢোক, ওর সঙ্গে দু'একটা কথা বলে আয়। দেখ কী করে!

আমি? ওর ঘরে ঢুকব?

তুই একটা জলের জাগ রেখে আয় ওর ঘরে। ওর তো জলতেষ্টা পেতে পারে। আমি পাউরুটি আর জ্যাম রেখে এসেছি ওর ঘরে, খিদে পেলে তাই খাবে। চল না, ভয় কী, আমি তো আছি!

স্বর্ণ খুব মজা পেয়ে আমার দিকে ঠোঁট টিপে হাসছে। নিলয়দা যখন ধরেছে, তখন যেতেই হবে, তর্ক করে লাভ নেই। শরীরটা যদি ভাল থাকতো, অনেক বেশি সাহস দেখাতে পারতাম।

একটা প্লাস্টিকের জাগে জল নিয়ে আমি পাগলের ঘরের হুড়কোটা খুললাম। লোকটি খাটের ওপর হাঁটু গেড়ে ঠিক একই ভঙ্গিতে বসে আছে। আমি ঘরের মধ্যে ঢোকার পর সে ফিরেও তাকাল না। দেয়াল-ঘেঁষা একটা ছোট টেবিলের ওপর খাবার রয়েছে। আমি জাগটা সেখানে নামিয়ে রাখলাম।

তারপর বললাম, এই যে, খাবার জল রইল।

আমার গলা কাঁপেনি বটে, কিন্তু বুকের মধ্যে এমন ঢিপ ঢিপ করছে যে, সে শব্দ যেন নিজেই শুনতে পাচ্ছি। পাগলকে এত ভয় পাবার কী আছে? প্রত্যেক মানুষেরই ব্যবহার সম্পর্কে আমরা একটা ধারণা করে নিই, পাগল সম্পর্কে সেই ধারণাটা করা যায় না বলেই ভয়?

আমার কথা শুনেও লোকটি ফিরে তাকাল না।

নিলয়দা এবারে ঘরের মধ্যে ঢুকে বলল, এই যে, শুনছেন? এর নাম হচ্ছে নীলু। আমার ছোট ভাইয়ের মতো, এ আপনার দেখাশুনো করবে। কোনও দরকার হলে একে ডাকবেন।

লোকটি তবু ফিরে তাকাল না। সে এক মনে দেয়াল দেখছে।

ঘর থেকে বেরিয়ে এসে নিলয়দা হাসিমুখে বলল, দেখলি? ভয়ের কিছু নেই, এমনিতে খুব শান্ত। আসলে কী জানিস, একবার যাদের একটু মাথার গোলমাল হয়, অন্যলোক তাদের এত ডিসটার্ব করে যে তাতে তাদের আরও মাথা খারাপ হয়ে যায়।

ঘরের দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে নিলয়দা বলল, ঠিক আছে। আমি চললাম। পাঁচটা পঁয়তাল্লিশের মধ্যেই ফিরে আসব। নীলু, তোর বাড়িতে খবর দিয়ে দেব।

বাড়িতে এখন এক পাগল আর দুই যুবতী, মাঝখানে আমি। অবস্থাটা মোটেই সুখকর নয়। স্বর্ণ যে প্রথমে এ বাড়িতে এসে আমাকেই পাগল ভেবেছিল, সেজন্য মনে একটা জ্বালা ধরে আছে। ওর দিকে ভাল করে তাকাতেই ইচ্ছে করছে না। পৃথিবীতে একমাত্র

নিলয়দা ছাড়া আর কারুর অনুরোধেই পাগল-পাহারা দেবার কাজ নিতে রাজি হতাম না আমি।

বসবার ঘরে এসে রূপাবউদি বলল, এবারে একটু ভাল করে চা খাওয়া যাক। আমি জল বসিয়ে দিয়ে আসছি। দুপুরে, খাওয়া-দাওযা নিয়ে বেশি ঝঞ্ঝাট করার দরকার নেই। বেশি করে ময়দা মাখা আছে, লুচি আর ডিম ভাজা খেয়ে নিলেই হবে।

একটু থেমে গিয়ে রূপাবউদি বলল, কিন্তু নীলু, তুমি কী খাবে? তোমার কি লুচি সহ্য হবে।

আমি আজকের দিনটা উপোস দেব।

সেটা কিন্তু খারাপ নয়। আজ স্টমাককে রেস্ট দেওয়াই উচিত। বিকেলের দিকে যদি খিদে পায়, তখন চিড়ে ভিজিয়ে দেব!

রূপাবউদি ঘর ছেড়ে চলে যেতেই আমি খবরের কাগজ টেনে নিলাম। টেবিলের ওপর পড়ে থাকা পত্রপত্রিকাগুলো গুছোচ্ছে স্বর্ণ। ঘরের মধ্যে শুধু একটি ছেলে আর একটি মেয়ে উপস্থিত থাকলে ছেলেটিকেই প্রথম কথা শুরু করতে হয়। আমার সেরকম কোনও উৎসাহ নেই।

কিন্তু স্বর্ণ এসব নিয়ম মানেনা। সে একটু পরেই জিজ্ঞেস করল, আপনার বুঝি লুচি সহ্য হয় না? এরকম আমি কক্ষনও শুনিনি।

আমি শুধু মুখ তুলে তাকালাম একবার। কোনও উত্তর দিলাম না।

আপনি কাল আমার দিদির গায়ে বমি করে দিয়েছিলেন কেন? খুব মদ খেয়ে এসেছিলেন?

এবারে আমাকে একটা কড়া চাহনি দিতেই হল। তারপর বললাম, আমি ড্রিঙ্ক করলেও কোনও দিন বমি করি না। কাল আমার ফুড পয়জনিং হয়েছিল, আর খুব জ্বর, জ্ঞান ছিল না।

ফুড পয়জনিং হলে বুঝি নিজের বাড়ি না ফিরে বমি করার জন্য অন্য লোকের বাড়িতে যেতে হয়?

আমার কাল বাড়ি ফেরার উপায় ছিল না। আপনি বোধহয় নিলয়দার সঙ্গে আমার কী সম্পর্ক তা জানেন না।

ফট করে আলো জ্বলে ওঠার মতো স্বর্ণর মুখটা ঝলমলে হাসিতে ভরে গেল। মাথাটা পেছন দিকে হেলিয়ে হাসতে হাসতে স্বর্ণ বলল, আপনার ভাগ্যিস গোঁফ নেই, থাকলে গোঁফগুলো এখন সব খাড়া খাড়া হয়ে উঠত! বাবাঃ কী রাগ, রেগে গেছেন! ছেলেদের রাগাতে আমার খুব ভাল লাগে। ছেলেরা ভাবে মেয়েরা সব সময় মিষ্টি মিষ্টি নরম নরম কথা বলবে! একটু অন্য রকম বললেই তাদের রাগ হয়ে যায়।

এবারে আমি একটা অবজ্ঞার হাসি দিলাম। স্বর্ণর সঙ্গে আমি ছেলেখেলা করতে চাই না।

পাশের ঘরের পাগলটি আবার যেন কী বলে উঠল। বোঝা গেল না ঠিক।

স্বর্ণ একটা চেয়ার টেনে ঠিক আমার মুখোমুখি বসল। আমি সোজা ওর চোখের দিকে তাকালাম। এমএসসি পাশ করার পর অ্যাপ্লায়েড ম্যাথমেটিক বা ওই ধরনের কোনও বিষয় নিয়ে রিসার্চ করছে স্বর্ণ। শুনেছি ভাল সাঁতারও কাটে। মুখে একটু কঠোর ভাব থাকলেও শরীরের গড়নটি বেশ সুন্দর, রূপাবউদির মতোই লম্বা। এই ধরনের মেয়েদের সঙ্গে ভাব জমাবার চেষ্টাই আমি করি না। বিদেশি বাতাস এদের উড়িয়ে নিয়ে চলে যায়। আর দু'চার বছরের মধ্যে বিলেত বা আমেরিকার কোনও বাঙালি ইঞ্জিনিয়ার বা ডাক্তারের ঘরণী হয়ে স্বর্ণ অ্যাপ্লায়েড ম্যাথমেটিকস ভুলে যাবে। ছেলেপুলে মানুষ করায় ব্যস্ত হয়ে পড়বে। চোখের দিকে তাকিয়ে আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি স্বর্ণর ভবিষ্যৎ জীবন।

স্বর্ণ জিজ্ঞেস করল, আপনি কোন ইয়ারে পাশ করেছেন?

কী পাশ করার কথা বলছেন? আমি কিছুই পাশ করিনি।

আপনি ইউনিভার্সিটিতে পড়েননি?

না।

কিন্তু আপনাকে আমি কলেজস্ট্রিট কফি হাউসে দেখেছি।

ফেল করা ছাত্রদের কি ওখানে যাওয়ার কোনও নিষেধ আছে?

স্বর্ণ একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে আমার দিকে। নারী-সুলভ কোনও সঙ্কোচ নেই। একবারে চোখ দু'টি একটু কুঁচকে গেল। তারপর অনেকটা আপন মনে বলল, আমি আপনাকে স্টাডি করার চেষ্টা করছি কিন্তু ঠিক ধরতে পারছি না। আপনি কেশ এলিউসিভ ক্যারেকটার।

ধন্যবাদ।

কীসের জন্য?

আমার সম্পর্কে আপনি এতটা আগ্রহ প্রকাশ করছেন বলে। কোনও সুন্দরী মেয়ে আমাকে স্টাডি করতে চাইছে, এ-রকম সৌভাগ্য আমার ঘটে না।

নিলয়দা আপনাকে দুপুরটা এখানে থাকতে বলল, আপনি থেকে গেলেন। কাল রাত্তিরে বাড়ি ফেরেননি। আপনি বুঝি প্রায়ই এ-রকম যেখানে সেখানে থেকে যান?

সবাই থাকতে দেয় না, কেউ কেউ তাড়িয়েও দেয়।

নিলয়দাকে আপনি কত দিন ধরে চেনেন?

এই চার-পাঁচ বছর।

নিলয়দা একটা পাগল ধরে এনেছে, আপনি জানেন, নিলয়দা নিজেও একটা পাগল?

রূপাবউদি চায়ের ট্রে নিয়ে ঢুকে বললেন, কী হয়েছে? ঝগড়া করছিস নাকি?

স্বর্ণ বলল, না, আমি বলছিলাম যে নিলয়দা নিজেও একটা পাগল।

ঠিক বলেছিস! মাঝে মাঝে যা কাণ্ড করে... শোনো নীলু, তোমার সঙ্গে পরামর্শ আছে। এই পাগলটাকে নিয়ে কী করা যায়, তা আমাদেরই ঠিক করতে হবে, তোমার নিলয়দার কথা শুনলে চলবে না।

স্বর্ণ বলল, নিলয়দা ওকে নিয়ে কী করবে, আমি জানি। নিলয়দা ওর চিকিৎসা করবে, ডাক্তার ডেকে নয়, নিজে নিজে।

রূপাবউদি বলল, সে ওর যা ইচ্ছে হয় করুক। কিন্তু ওকে এ বাড়িতে রাখা চলবেনা। সবসময়ে নিজের বাড়িতে ভয়ে ভয়ে থাকব নাকি আমি? ওকে কোনও একটা পাগলা গারদে ভর্তি করার ব্যবস্থা করো।

রাঁচিতে পাঠিয়ে দিলেই হয়!

কলকাতাতেও কী একটা উন্মাদ আশ্রম আছে না? রাস্তার লোকেরা একটা পাগলকে মারছিল, সে-জন্য পুলিশে খবর দিলেই তো হয়? পুলিশ যা ব্যবস্থা করার করবে। বাড়িতে নিয়ে আসার কোনও মানে হয়!

এবারে আমি খানিকটা সন্দেহ জানিয়ে বললাম, বউদি, পুলিশে কি পাগল ধরে? তাহলে রাস্তায় প্রায়ই পাগল ঘুরে বেড়াতে দেখি কেন?

রূপাবউদি বলল, এটা তো পুলিশেরই কাজ।

পাশের ঘরের দরজায় দুম দুম করে ধাক্কা পড়তেই আমরা সবাই নিস্তব্ধ হয়ে গেলাম। ধাক্কার শব্দ থামল না।

আমাকে উঠতেই হল। পাগলটা দরজায় জোরে জোরে লাথি মারছে।

আমি কাছে গিয়ে কড়া গলায় ধমকে বললাম, কী হয়েছে? এত জোরে ধাক্কা দিচ্ছেন কেন?

পাগলটি সরাসরি আমার প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে বলল, কোনও দরজা আমাকে চায় না, আমিও কোনও দরজা চাইনা! সোজা কথা।

দরজা খুলে দেব?

কোন শালা ষাঁড়ের ল্যাজ মুচড়ে দিয়েছিল, অ্যাঁ? কোন শালা।

এত জোরে সে লাথি মারছে দরজায় যে, এই আওয়াজে এবার পাড়া-প্রতিবেশিরা ছুটে আসবে। আমি হুড়কোটা খুলে দিলাম। সঙ্গে সঙ্গে রূপাবউদি ভয় পেয়ে বসার ঘরের দরজা বন্ধ করে দিল।

পাগলটি বেরিয়ে এসে দাঁড়াল উঠোনের মাঝখানে। তার মাথার এক পাশের চুলে রক্তচাপ বেঁধে আছে। পাঞ্জাবির পিঠের কাছেও লেগে আছে রক্তের ছাপ। নিলয়দা না আটকালে একেকাল রাস্তার লোকে মেরেই ফেলত, কোনও সন্দেহ নেই। আজকাল কেউই দু'চার ঘা থাপ্পড় দিয়ে কারুকে ছাড়ে না।

পাগলটি অস্থির পায়ে উঠোনের এ-দিক ওদিক ঘোরাঘুরি করতে লাগল। কী যেন খুঁজছে। তারপর হঠাৎ চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ে চেয়ে রইল আকাশের দিকে।

আমার মনে হল, ওর তো রাস্তায় শুয়ে শুয়ে আকাশ দেখা অভ্যেস, তাই অনেকক্ষণ আকাশ না দেখে ও বোধহয় অস্বস্তি বোধ করছিল।

শুয়ে শুয়ে ও বলতে লাগল, আমিও ষাঁড়ের ল্যাজ মুচড়ে দিইনি, তুমিও ষাঁড়ের ল্যাজ মুচড়ে দাওনি, তাহলে কে দিল? শুধু শুধু ষাঁড়টা খেপে গেল? অ্যাঁ, এই তো অবস্থা! আমি যদি সব সত্যি কথা বলে দিই, তুমি যদি সব সত্যি কথা বলে দাও, তবে চন্দ্র-সূর্য পর্যন্ত লজ্জা পেয়ে যাবে। কিন্তু তুমিও লজ্জা পাবে না, আমিও লজ্জা পাব না। মানুষ লজ্জা পায় না। অ্যাঁ? এই তো অবস্থা!

লোকটির গলার আওয়াজ গমগমে, উচ্চারণও স্পষ্ট। এখন পাগল বলে মনেই হয় না। এই সব কথাগুলো কি কোনও নাটক বা যাত্রার সংলাপ? আমার ভয় ভয় ভাবটা কিছুতেই কাটছেনা। নেহাৎ দু'জন মহিলা উপস্থিত আছে বলে আমাকে সাহসী হতেই হবে। কাছে এগিয়ে গিয়ে আমি জিজ্ঞেস করলাম, আপনার নাম কী?

লোকটি বড় বড় চোখ মেলে আমার দিকে তাকিয়ে রইল।

আমি প্রথমে নিজের বুকে আঙুল ঠেকিয়ে বললাম, আমার নাম নীলু!

তারপর ওর বুকের দিকে আঙুল নির্দেশ করে বললাম, আপনার নাম কী?

লোকটি বলল, কুত্তার বাচ্চা! আমাকে লাঠি দিয়ে মারছিল।

আপনাকে মারছিল? কেন? কী হয়েছিল?

আমাকে কেউ চেনে না, আমিও কারুকে চিনি না, ব্যাস! সোজা কথা। লোকটি আবার ধড়মড় করে উঠে দাঁড়াতেই আমি সরে গিয়ে দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়ালাম।

লোকটি আবার বোঁ বোঁ করে ঘুরতে লাগল। মাঝে মাঝে দেয়ালের সামনে দাঁড়িয়ে দেয়ালটাকে ঠেলবার চেষ্টা করে, তার লম্বা লম্বা আঙুলগুলো দেয়ালের গায়ে যেন চেপে বসে যাবে। এক জায়গার দেয়াল ছেড়ে আবার অন্য জায়গার দেয়ালের কাছে যায়। একজন মানুষ দেয়াল ঠেলে সরাবার চেষ্টা করছে, এই দৃশ্য দেখলে গা ছম ছম করে। এর মধ্যে যেন পৌরাণিক আভাস আছে। লোকটিকে এখন অন্ধ মনে হয়।

একবার সে বসবার ঘরের বন্ধ দরজার সামনে দাঁড়াল। ভেতরে একটা হুড়োহুড়ির শব্দ পেলাম। বউদিরা নিশ্চয়ই কোনও ফাঁক-ফোকর দিয়ে লক্ষ্য রাখছিল।

লোকটি কিন্তু দরজাটা ধাক্কাল না। দরজার গায়ে গাল ঠেকিয়ে আঁ আঁ করে একটা কাতর শব্দ করতে লাগল, আমার দিকে তার চোখ। ওর ভেতরে একটা কিছু প্রবল কষ্ট হচ্ছে যেন। কিন্তু ভাষা দিয়ে তো ওর মনের কথা জানার উপায় নেই।

হঠাৎ আমাকে চমকে দিয়ে সদর দরজার কলিং বেলটা বেজে উঠল ঝন ঝন করে। দু'বার বেলটা বাজল। আমি দৌড়ে গিয়ে খুলে দিলাম দরজাটা। দু'জন অচেনা মহিলা দাঁড়িয়ে, এক জন মিহি গলায় বলল, আমরা মার্কেটিং রিসার্চের ব্যাপারে এসেছি, আপনারা কী টুথপেস্ট ব্যবহার করেন।

আমি স্পষ্ট বুঝতে পারছি, বেলের আওয়াজ শুনে পাগলটিও চমকে উঠেছিল, সে-ও এই দিকে এসেছে, আমার পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে। এই পাগলটা মেয়েদের দেখলেই হিংস্র হয়ে ওঠে, আমার দরজা খোলাই ভুল হয়েছে।

আমি বললাম, এখন সময় নেই, পরে আসবেন।

অন্য মহিলাটি আরও মিহি গলায় বলল, দেখুন আমরা মাত্র সাত মিনিট সময় নেব, আমাদের একটা কোয়েশ্চেনেয়ার আছে।

বললাম তো এখন সময় নেই!

দড়াম করে দরজা বন্ধ করে দিলাম ওদের মুখের ওপর। ওরা বোধহয় আমাকেই পাগল ভাবল।

পাগলটির নিশ্বাসের আঁচ যেন লাগল আমার গায়ে। আমি শিউরে উঠে সরে গেলাম। পাগলটি সত্যিই আমার গা ঘেঁষে এসেছে, আমি তাড়াতাড়ি চলে এলাম উঠোনের দিকে।

এক জন মানুষের সান্নিধ্যে কখনও এ-রকম ঘিনঘিনে ভাব হয়নি। লোকটির গায়ে একটা উৎকট গন্ধও আছে বটে।

সদর দরজার ছিটকিনিটা বন্ধ করা হয়নি। পাগলটা যদি বাইরে বেরিয়ে যায়? যায় তো যাবে, আমার বাধা দেবার কোনও মানে হয় না। কারুর ব্যক্তিস্বাধীনতায় আমি হস্তক্ষেপ করতে চাইনা। ও এখানে থাকবে না যাবে, তা ও নিজেই ঠিক করুক।

কিন্তু ও গেল না। হয়তো সব দরজাই ও বন্ধ মনে করে। দরজাটার গায়ে একটা কিল মেরে ও ফিরে এল উঠোনে। ফিস ফিস করে বলল, ষাঁড়ের ল্যাজ কে মুচড়ে দিয়েছে? তুমিও দাওনি, আমিও দিইনি! এই তো ব্যাপার। হায় মাধুরী!

তারপর আমার দিকে একটা ঘোলাটে দৃষ্টি দিয়ে আফিংখাওয়ানো জন্তু যেমন ভাবে আবার খাঁচার মধ্যে ফিরে যায়, সেইভাবে ঢুকে গেল নিজের ঘরে। নিজেই দরজাটা বন্ধ করল। আমি হুড়কো টেনে দিলাম। আমি রীতিমতো ঘেমে গেছি। নিলয়দা বড্ড কঠিন দায়িত্ব দিয়ে গেছে আমার ওপরে। এরই মধ্যে আমি অবসন্ন বোধ করছি। এই পাগল এ-রকম ভাবে কতবার ঘর থেকে বেরুবে কে জানে!

বসবার ঘরের দরজাটা আবার খুলে গেল। গনগনে রাগী মুখে রূপাবউদি বলল, তুমিই বলল, এ-ভাবে বাড়িতে থাকা যায়?

স্বর্ণ বলল, আমার কিন্তু লোকটাকে ভাল করে দেখতে ইচ্ছে করে। কীরকম পাগল? কোনও আশা নেই?

রূপাবউদি বলল, থাক, আর দেখতে হবে না। চল আমরা ওপরে যাই। ওপরের সিঁড়ির দরজা বন্ধ করে দিচ্ছি। নীলু, তুমি নিচে থাকো।

আমি বসবার ঘরের সোফায় গা এলিয়ে দিলাম।

আস্তে আস্তে খিদে পাচ্ছে। কাল বিকেলের পর কিছুই খাইনি, বমি করেছি প্রচুর। খিদেটাই স্বাস্থ্যের লক্ষণ। রূপাবউদি দুপুর খেতে দেবেন না বলেছেন। দেখা যাক।

সাত্যকি বসুমল্লিকের কথা মনে পড়ে গেল আবার। তিনি এখন কী করছেন? এখন এগারোটা সাড়ে এগারোটা বাজে। সাত্যকি বসুমল্লিকের মতো বনেদী পরিবারের লোকেরা আগে এই রকম সময়ে ঘুম থেকে উঠত। কিন্তু সেসব দিন আর নেই, তাছাড়া ইনি কর্মিষ্ঠ পুরুষ, ভাবভঙ্গি দেখলেই বোঝা যায়। সাত্যকি বসুমল্লিকের তিন-চারটে ব্যবসা, তারই কোনও একটা অফিসে তিনি এখন বসে আছেন নিশ্চয়ই। মস্ত বড় একটা সেক্রেটারিয়েট টেবিল। যার যত বড় টেবিল তার তত বেশি ব্যক্তিত্ব। তুচ্ছ একটা কাঠের টেবিল, কিন্তু তার এ-পাশে আর ও-পাশে বসবার মধ্যেই অনেক কিছুই বদলে যায়। আমাদের স্কুলে অঙ্কের টিচার ছিলেন অম্বিকাবাবু, তার মেজাজের কাছে আমরা কাঁচুমাচু হয়ে থাকতাম। তিনিই আবার হেড মাস্টারের টেবিলের উলটো দিকে বসলে মিন মিন করে কথা বলতেন। অম্বিকাবাবুর ছেলে নকশাল হয়েছিল, সেই কারণে তাকে একবার যেতে হয়েছিল থানায়, সেখানে দারোগার টেবিলের উলটো দিকে বসে তিনি একেবারে কেঁচো হয়ে গিয়েছিলেন। অথচ কত হবু দারোগা কিংবা হবু-জজ-ম্যাজিসট্রেট অম্বিকাবাবুর দাঁতখিচুনি খেয়ে গেছে!

সাত্যকি বসুমল্লিকের নিখুঁত ভাবে দাড়ি কামানো ফর্সা মুখে নীলচে আভা। টেবিলের ওপর তিনখানা টেলিফোন। একটা কালো, একটা সাদা, একটা গোলাপি। সবুজ টেলিফোন হয়, হলদেও হয়, টুকটুকে লালও হয়। তাহলে সাত্যকি বসুমল্লিকের ঠিক কী কী রঙের টেলিফোন আছে, এটা যেন জানা আমার বিষম দরকার। অফিসে নিশ্চয়ই ধুতি-পাঞ্জাবি পরে যান না। স্যুট না ক্যাজুয়াল? কোনও দিন এই ধরনের মানুষের মাথার চুল কপালে এসে পড়ে না। উনি ধূমপান করেন না, আমি লক্ষ্য করেছি, ভিজিটারদের সঙ্গে কথা বলার সময় হাতের কলমটা কামড়ে ধরাও ওঁর পক্ষে অসম্ভব।

নেতারহাট বাংলোতে হঠাৎ দেখা হয়েছিল, তবু উনি বলেছিলেন, ঠিক আমার মতো একটি ছেলেকেই উনি খুঁজছেন, আমাকে বিশেষ ভাবে অনুরোধ করেছিলেন ওঁর সঙ্গে কলকাতায়

দেখা করবার জন্য। আমি ওঁর কাছে চাকরি চাইনি, কোনও রকম দৈন্য প্রকাশ করিনি, তবু আমাকে এ-রকম প্রস্তাব দেবার মানে কী? একে স্পর্ধা বলে না? কলেজ জীবনে আমরা এই ধরনের লোকদের বলতাম অমায়িক খচ্চর!

আমি এখন পাগলের পাহারাদার হয়ে বসে আছি, আর সাত্যকি বসুমল্লিক হাসি মুখে একদল মানুষের ওপর দয়ালু-প্রভুত্ব করে যাচ্ছেন। আমি ওঁর সঙ্গে জায়গা বদলাবদলি করতে চাইনা, কিন্তু কোনও এক দিন সাত্যকি বসুমল্লিককে রাস্তার কোনও পাগলের মুখোমুখি দেখতে চাই। সাত্যকি বসুমল্লিক পাশ কাটিয়ে যেতে চাইলে আমি বলব, তুমি নিলয়দার পা ধোয়া জল খাও।

পাগলটা আবার কী যেন চেঁচিয়ে উঠল। আমার উঠতে ইচ্ছে করল না। দরজায় তো লাথি মারেনি।

পাগলটার নামটা পর্যন্ত জানা গেল না। একজন মানুষকে আমি দেখাশুনো করছি, অথচ তার নাম জানি না, এর কোনও মানে হয়? খানিকক্ষণ ধরে আমি ভাবতে লাগলাম, ওর কী একটা নাম দেওয়া যায়। প্রথমে মনে এল দিগম্বর। তারপর ভাবলাম, এক জন লম্বা-চওড়া, মোটামুটি সুশ্রী মানুষের ওপর এরকম একটা বিদঘুটে নাম চাপিয়ে দেওয়া কি উচিত? না, এটা অন্যায়। তারপর মনে পড়ল, ভোলানাথ। হ্যাঁ, এইনামটাই ওকে মানাবে।

.

০৪.

নিলয়দা ভোলানাথের ছবি তুলে দুটি খবরের কাগজে সেই ছবি ছাপিয়ে বিজ্ঞাপন দিয়েছে। এর মধ্যে দিন চারেক কেটে গেছে আমি আর ওদিক ঘেঁষিনি। খবর পেয়েছি নিলয়দা ভোলানাথকে এখনও বাড়ি থেকে সরায়নি, সুতরাং নিলয়দার স্ত্রী ও শ্যালিকা, এই দুই তলোয়ারের মতো জিভওয়ালা নারী যে প্রতি মুহূর্তে নিলয়দাকে কচুকাটা করছে,

তা বোঝাই যায়। ওর মধ্যে আমি সাধ করে কেন যেতে যাব। তাছাড়া আমার কি নিজস্ব ব্যাপারস্যাপার নেই?

নিলয়দা ছুটি নিয়েছে অফিস থেকে। বাড়ির টেলিফোন খারাপ, সুতরাং আমাকে ডাকাডাকিও করতে পারছে না। আমিও পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছি। পাগলটির থেকেও এখন স্বর্ণকেই আমার বেশিভয়। সে আবার আমার চরিত্র স্টাডি করতে চায়।

দূরে দূরে থেকেও আমি নিলয়দাকে খানিকটা সাহায্য করার চেষ্টা করেছিলাম। কলকাতার মধ্যে কিংবা কাছাকাছি কোথাও পাগলদের রাখবার ব্যবস্থা আছে কিনা তা জানবার জন্য আমি গিয়েছিলাম পার্থদার কাছে। পার্থদা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের হেলথ ডিপার্টমেন্টের খুব বড় অফিসার, উনি সব হাসপাতালের খবর নিশ্চয়ই জানবেন। পার্থদা আমাকে নিয়ে গেলেন ড. এ আর দত্তগুপ্তর কাছে। ড. দত্তগুপ্ত হলেন ডিএইচএস, অর্থাৎ ডাইরেক্টর অফ হেলথ সার্ভিসেস। ইনি আবার নাম করা নিউরোলজিস্ট।

ড. দত্তগুপ্তকে আমি সবকথা খুলে বললাম। শুনে-টুনে তিনি যা দুখানা মতামত দিলেন, তা শুনে আমার চক্ষু চড়কগাছ। আর মনটা একেবারে সেঁধিয়ে গেল পাতালে।

ড. দত্তগুপ্ত বললেন, পাগলকে বাড়িতে আশ্রয় দেওয়া সহজ, কিন্তু তাকে বাড়ি থেকে তাড়ানো অতি কঠিন। দয়া-মায়া এ-সব হল অতি পুরনো ইনসটিংক্ট, এমনকী বিকৃত মস্তিষ্ক মানুষের মনেও এর স্পর্শ একবার লাগলে সহজে মুছে যায় না। রাস্তার যে-পাগল মার খায়, সে যদি হঠাৎ এক জন মানুষের কাছ থেকে দয়া পায়, তবে তাকে আর সে কিছুতেই ছাড়তে চাইবে না। ওকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিলেও ফিরে আসবে। এমনকী কোনও নার্সিং হোম বা পাগলা গারদে ভর্তি করে দিলেও সেখান থেকে পালিয়ে ঠিক চলে আসবে রাস্তা চিনে। নিজের ইচ্ছেতে যদি ও চলে না যায়, তাহলে ওকে বিদায় করার সম্ভাবনা খুবই কম।

দ্বিতীয়ত, ওকে রাখা হবে কোথায়? সরকারের অধীনে যে দু'একটা মানসিক চিকিৎসার হাসপাতাল আছে, সেখানে বিন্দুমাত্র ঠাঁই নেই। দেশের সমস্ত বেওয়ারিশ পাগলের

চিকিৎসারভার যদি সরকারকে নিতে হয়, তাহলে পশ্চিমবাংলাতেই অন্তত একশোটা আরও এ-রকম হাসপাতাল খোলা দরকার। নানা রকম টেনশান বেড়েছে বলে দেশে পাগলের সংখ্যাও দিন দিন বাড়ছে। আর্থিক সঙ্গতি না থাকলে তাদের চিকিৎসা করবার কোনও সুযোগ নেই।

তাছাড়া, ড. দত্তগুপ্ত বললেন, ধরুন যদি কোনও হাসপাতালে জায়গা করা যায়, তাহলেও ওই পাগলটিকে ভর্তি করার দায়িত্ব কে নেবে? অতি নিকট আত্মীয় ছাড়া কোনও মানুষকে কেউ পাগল বলে হাসপাতালে ভর্তি করতে পারে না। এটাই আইন। পয়সা খরচ করে যদি রাঁচিতেও পাঠাতে চান, তাহলেও সার্টিফাই করতে হবে যে, রোগী আপনার কে হয়। মিথ্যে পরিচয় দিলে জেল হয়ে যাবে। কেন বুঝলেন তো? মনে করুন, কারুর ওপরে আপনার রাগ আছে। আপনি তাকে পাগল সাজিয়ে জোরজার করে কোনও পাগলা গারদে ভর্তি করে দিতে তো পারেন!

আমি জিজ্ঞেস করলাম, তাহলে কি কোনও উপায় নেই?

ড. দত্তগুপ্ত বললেন, গভর্নমেন্টের ভ্যাগরান্সি কন্ট্রোল বলে একটা ডিপার্টমেন্ট আছে। পাগলটাকে কোনও রকমে রাস্তায় বার করে দিন। ভ্যাগরান্সি কন্ট্রোলের লোকদের আগে থেকেই খবর দিয়ে রাখবেন, তারা যদি ধরে নিয়ে গিয়ে কিছু ব্যবস্থা করতে পারে।

ড. দত্তগুপ্ত আমাকে পাঠালেন ভ্যাগরান্সি কন্ট্রোল অফিসার ইনচার্জ সি.আরদাশের কাছে। সি.আর দাশ কিন্তু চিত্তরঞ্জন দাশ নয়। ইনি হলেন ছবিরানি দাশ।

আমার মনে হয়েছিল ডিএইচএস ড. দত্তগুপ্ত যেন আমার আগ্রহের প্রতি তেমন কোনও গুরুত্ব দেননি। নিলয়দার কাহিনি শুনে তাঁর মনে হয়েছিল, এটা এক জন লোকের উদ্ভট খেয়াল, এখন সে বুঝুক ঠ্যালা! এক জন অসহায় উন্মাদকে কী করে বাঁচানো যায়, সে সম্পর্কে তার কোনও মাথাব্যথা নেই। তিনি অনেক বড় বড় সমস্যা নিয়ে ব্যস্ত।

শ্রীমতী সি আর দাশের কাছে এসে সেই প্রমাণই পেলাম। ভদ্রমহিলা এই বিভাগে এক জনের বদলিতে কাজ করছেন, যে-কোনও দিন ট্রান্সফার অর্ডারের অপেক্ষায় আছেন। সব শুনে তিনি ভুরু তুলে বললেন, অ্যাঁ? ডিএইচএস আপনাকে পাঠিয়েছেন আমার কাছে? তিনি নিশ্চয়ই ঠাট্টা করেছেন আপনার সঙ্গে। ভ্যাগরান্সি কন্ট্রোল ব্যাপারটা কী জানেন? এটা খোলা হয়েছিল ব্রিটিশ আমলে, শহরের রাস্তায় ভবঘুরে ছেলে-মেয়ে দেখলে তাদের আটকে রাখবার জন্য। এখন এই দফতরটা কেন আছে কেউ জানে না। কলকাতার রাস্তায় এখন পঞ্চাশ-ষাট হাজার মানুষ রাত্তিরে ঘুমোয়, তাদের ক'জনকে আমরা ধরে আনব? অ্যাঁ? বলুন আপনি? আমরা এক জনকেও ধরি না। আমাদের যা বাজেট, ডিপার্টমেন্টের সব ক'জন কর্মচারীর মাইনে দিতেই কুলোয় না। সুতরাং ডিপার্টমেন্ট আছে, কিন্তু প্রায় কোনও কাজই নেই। হাওড়ার আন্দুল রোডে একটা নতুন ভ্যাগরান্ট হোম তৈরি হবার কথা, কবে সেটা শেষ হবে জানি না। এখন একটা পুরনো লঝঝরে বাড়িতে কিছু ছেলেকে আটকে রাখা হয়েছে। তাদেরই খাওয়া জোটে না, এর পরেও আমরা রাস্তার পাগল ধরে আনব?

আমি বিনীত ভাবে জিজ্ঞেস করলাম, তাহলে রাস্তার পাগল ধরার কোনও ডিপার্টমেন্ট নেই? ছবিরানি দাশ এক জন মধ্যবয়স্কা মহিলা। মুখে ক্লান্তি ও তিক্ততার ছাপ। বিদ্রুপের সঙ্গে বললেন, কে জানে! আপনি জানেন কি, ব্রিটিশ আমলের গোড়ার দিকে কলকাতার রাস্তায় কেউ ভিক্ষে করলে তাকে ফাইন দিতে হত কিংবা তার জেল হত। খুঁজে দেখুন গিয়ে, এই ভিখিরির শহর কলকাতায় এখনও হয়তো সরকারের কোনও ভিখিরদমন ডিপার্টমেন্ট আছে। আপনি বরং কলকাতা করপোরেশানে গিয়ে খোঁজ করুন, রাস্তার পাগলা কুকুর ধরা যেমন ওদের কাজ, সেই রকম রাস্তার পাগলও...।

আমি অবশ্য আর করপোরেশন অফিসে যাইনি।

নিলয়দার কথা ভেবে মনটা ভারাক্রান্ত হয়ে রইল, কিন্তু ওদের বাড়িতে গিয়ে যে প্রত্যক্ষ ভাবে নিলয়দাকে কিছু সাহায্য করব, সে-সাহস হল না।

পৃথিবীর আহ্নিক গতি অনুযায়ী এক-একটা দিন কেটে যেতে লাগল, আকাশের রঙ বদলাল, অন্যান্য বছরের তুলনায় একটু আগেই চলে এল বর্ষা। আমার বান্ধবী রানির সঙ্গে আমার মন কষাকষি মিটে গেল। গঙ্গায় এক দিন নৌকো করে বেড়াতে গিয়ে হঠাৎ পড়লাম ঝড়ের মুখে, নৌকো প্রায় উলটে যায় আর কী, আর তাই নিয়ে এমন মজা হল যে বেশ কয়েক দিন সাত্যকি বসুমল্লিকের কথাও আমার মনে পড়েনি।

তবু এরই মধ্যে এক দিন ভুল করে চলে গেলাম কলেজ স্ট্রিট কফি হাউসে। কারুর আহ্বানে নয়, কারুর খোঁজে নয়, এমনিই।

কফি হাউসে আমাদের নিজস্ব দু'তিনটে টেবিল থাকে, বন্ধু-বান্ধবরা সেখানেই ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসে। তার বাইরে অন্যান্য টেবিলে কী হয় না হয় আমরা লক্ষ্য করি না। তিনতলার জানলার পাশে একটা টেবিলে যে স্বর্ণ আর তার বন্ধু-বান্ধবীরা নিয়মিত আড্ডা দেয় তা আমি জানতাম না। আমরা বসি দো-তলায়।

তিন তলা থেকে স্বর্ণ আমাকে দেখতে পেয়ে দো-তলায় নেমে এসে আমার টেবিলের কাছে দাঁড়াল। প্রায় মহারানির ভঙ্গিতে আদেশের সুরে বলল, একটু উঠে আসুন, আপনার সঙ্গে জরুরি কথা আছে।

অনুগত ক্রীতদাসের মতো আমি উঠে দাঁড়ালাম। যারা স্বর্ণকে চেনে না, তারা স্বর্ণর শুধু দেহশ্রী দেখে মুগ্ধ হবেই। আমরা বন্ধুরা সবাই হঠাৎ কথা থামিয়ে স্বর্ণকে দেখতে লাগল। ওরা নিশ্চয়ই আমার সৌভাগ্যকে ঈর্ষা করছে। হায় রে!

স্বর্ণ আমাকে নিয়ে এল দরজার কাছে। আমার চোখে চোখ রেখে ভৎর্সনার সুরে বলল, আপনাকে খানিকটা দেখে আমার যা মনে হয়েছিল, তাতে আমি ভাবতে পারিনি আপনি এতটা দায়িত্বজ্ঞানহীন হবেন!

ইয়ার্কি করার সুযোগ পেলে আমি ছাড়ি না। স্বর্ণর ব্যক্তিত্ব সম্পূর্ণ অবজ্ঞা করে আমি বললাম, তা হলেই বোঝা যাচ্ছে, মনুষ্য চরিত্র সম্পর্কে আপনার জ্ঞান খুবই কম।

আপনি সেই যে সেদিন বিকেলবেলা পালিয়ে এলেন...।

বলে কয়ে বিদায় নিয়ে আসাকে বুঝি পালিয়ে আসা বলে?

আপনি আবার আসব বলেছিলেন।

হ্যাঁ, আবার আসব বলেছিলাম, কিন্তু ঠিক কবে, কখন যাব তা বলিনি।

আমাকে আশ্চর্য করে দিয়ে স্বর্ণর মুখখানা হঠাৎ বিষাদে ছেয়ে গেল। মাটির দিকে চোখ নামিয়ে সে বলল, আপনাদের সেই পাগলকে নিলয়দা এখনও বাড়িতে রেখে দিয়েছে। এর মধ্যে কী কী হয়ে গেছে আপনি জানেন?

আপনাদের বলতে স্বর্ণ পাগল ভোলানাথের অভিভাবকদের দলে আমাকেও ফেলে দিয়েছে। নেহাৎ শরীর খারাপ হয়েছিল বলে আমি সেদিন নিলয়দার বাড়িতে উপস্থিত হয়েছিলাম। নইলে ওই পাগলের ব্যাপারে কি কোনও দায়িত্ব আছে?

কিন্তু স্বর্ণকে আর খোঁচা না দিয়ে আমি কিছুটা সিরিয়াস হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, কী হয়েছে এর মধ্যে?

স্বর্ণ বলল, আপনি যে চলে এলেন, সে-দিনই সন্ধেবেলা ওই পাগলটা আমার হাতের আঙুল কামড়ে ধরেছিল। আমি ওকে সেবা করতে গিয়েছিলাম, কিন্তু ও আমাকে..।

হঠাৎ থেমে গিয়ে স্বর্ণ দেয়ালের দিকে মুখ ফেরাল। না, প্রকাশ্য জায়গায় কেঁদে ফেলার মতো মেয়ে নয় স্বর্ণ। তবে মুখখানি শ্রাবণের মেঘ।

পাগলটা আপনাকে কামড়ে দিল? আপনি ওর কাছে গেলেন কেন? আমি যতক্ষণ ছিলাম, পাহারা দিয়েছি।

নিলয়দা বলল, মেয়েদের ওপর ওর অত রাগ, নিশ্চয়ই কোনও মেয়ে ওর সঙ্গে খুব খারাপ ব্যবহার করেছে। তোমরা ভয় পেয়ে দূরে সরে গিয়ে ওর সঙ্গে একটু ভাল ব্যবহার করো। সেই জন্য আমি ওকে খাবার দিতে গেলাম... দিদিকে যেমন ভাবে কামড়ে দিয়েছিল, আমাকেও ঠিক সেইভাবে, এই হাতখানা টেনে মুখের মধ্যে ভরে দিল! উঃ, ভাবলেও এখনও আমার...।

তারপর কী করে ছাড়ানো হল!

দিদি ওর মাথায় একটা গেলাস দিয়ে ঠুকে ঠুকে মারতে মারতে তারপর... এই দেখুন, দাঁত বসিয়ে দিয়েছিল।

স্বর্ণ তার বাঁ-হাতটা এগিয়ে দিল আমার দিকে। ওর হাতটা ধরে পরীক্ষা করা উচিত কি না সে-সম্পর্কে আমি মনস্থির করতে পারলাম না। সত্যিই স্বর্ণর স্বর্ণাভ আঙুলে একটা ছোট ক্ষত রয়েছে।

একটু সময় নিয়ে আমি জিজ্ঞেস করলাম, নিলয়দা কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়েছিল, কোনও উত্তর আসেনি?

না! কে ওর খোঁজ নিতে আসবে? ও তো মানুষ নেই, একটা হিংস্র পশু হয়ে গেছে।

দশ-বারো দিন হয়ে গেল।

দিদি পাপুনকে নিয়ে আমাদের বাড়িতে চলে এসেছে। এই ক'দিনের মধ্যে নিলয়দা একবারও দিদির সঙ্গে দেখা করতে আসেনি। ও-বাড়িতে রান্নার লোক আজও ফেরেনি, ঠিকে ঝি পাগলের ভয়ে কাজ ছেড়ে দিয়েছে। নিলয়দা একা রান্না করে খায়, আর সর্বক্ষণ ওই পাগলকে নিয়ে মেতে আছে।

সত্যি নিলয়দা বড্ড বাড়াবাড়ি করছে।

দিদি ডিভোর্সের কথা ভাবছে। পাপুন বাবাকে দেখার জন্য কান্নাকাটি করে। দিদি ওকে কিছুতেই ওবাড়িতে যেতে দেবেনা।

ব্যাপারটা যে এতখানি গড়িয়েছে, তা আমি জানতাম না।

রাস্তার একটা পাগলকে যতখানি সাধ্য সাহায্য করা উচিত, তা না হয় মানলাম, কিন্তু আমার দিদি আর পাপুনের জীবনটা যে নষ্ট হতে চলেছে, সেটা বুঝি কিছু নয়? নিলয়দা যা করছেন, সেটাও তো একটা চুড়ান্ত পাগলামি। আপনারা তাতে বাধা দেবেন না?

আচ্ছা, আমি নিলয়দার সঙ্গে দেখা করতে যাব। ওকে বুঝিয়ে বলব!

কখন যাবেন?

কাল, কালকে বিকেলের দিকে!

দপকরে জ্বলে উঠে স্বর্ণ বলল, কাল বিকেলে! এই সব কথা শোনার পরও আপনি এখন আড্ডা দিতে যাবেন? আপনার মনুষ্যত্ব বলে কিছু নেই? শুনুন, একটা কথা আপনাদের জানিয়ে রাখছি। আমার দাদার রিভলবার আছে। আমি ঠিক এবার গিয়ে ওই পাগলটাকে গুলি করে ফেলব! ওর বেঁচে থাকার কোনও অধিকার নেই।

আমি আজই, এক্ষুনি যাচ্ছি।

সত্যি যাবেন?

হ্যাঁ, বললাম তো, এক্ষুনি!

চলুন, আমি যাচ্ছি আপনার সঙ্গে।

আপনি যাবেন? না না, তার কোনও দরকার নেই। বিশ্বাস করুন, আমি সত্যিই এক্ষুনি যাব।

আমি আপনার সঙ্গে গেলে কোনও আপত্তি আছে?

না, মানে, যদি আবার আপনার কোনও বিপদ হয়!

আমি ভয় পাই না। নিলয়দাকে আমি কয়েকটা কথা বলব।

তাহলে আপনি নিচে নামুন, আমি সিগারেটের প্যাকেটটা ফেলে এসেছি, নিয়ে আসছি।

টেবিলে ফিরে এসেই আমি বন্ধুদের সকলের সামনে হাত ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে বললাম, টাকা দে, টাকা দে, যার যার কাছে স্পেয়ারেবল এক টাকা দুটাকা আছে, শিগগির দে!

দু'তিনজন স্বেচ্ছায় হাসতে হাসতে দিয়ে দিল, দু'এক জন একটু গাঁইগুই করছিল, কিন্তু আমি ওদের বেশি সময় দিলাম না, দশ-বারোটা টাকা প্রায় ছিনিয়ে নিয়ে, টেবিলের ওপর থেকে অন্য এক জনের সিগারেটের প্যাকেট তুলে দৌড় দিলাম সিঁড়ির দিকে।

কে যে কখন কীভাবে ঠকে তা অনেক সময় তারা নিজেরাই জানে না। বন্ধুরা ভাবল, আমি একটি সুন্দরী মেয়ের সঙ্গে মজা করতে যাচ্ছি বলে ওরা চাঁদা দিয়েছে। এই নিয়ে এখন খানিকটা রঙ্গ রসিকতা চলবে। ওরা যদি জানত, আমি কী বিপদসমুদ্রে ঝাঁপ দিতে চলেছি...।

অতিশয় কৃতিত্ব দেখিয়ে আমি পাঁচ মিনিটের মধ্যে একটা ট্যাক্সি ধরে ফেললাম। একটুখানি যাবার পরেই শুরু হল দুর্দান্ত বৃষ্টি। জানলার কাচ তুলে দিতে হল। বৃষ্টির তোড়ে কাচ ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে। আমি স্বর্ণর মুখের দিকে তাকাতেই সে বলল, আমার দাদা এক জন ডাক্তার নিয়ে গিয়েছিল। তিনি বলেছেন, ওই পাগলটা চিকিৎসার বাইরে চলে গেছে। অনেক দিন ধরে টানা শক থেরাপি করলে কিছুটা উন্নতি হতে পারে, সে-ও খুব খরচসাধ্য ব্যাপার।

বৃষ্টির মধ্যে কাচ তোলা ট্যাক্সির রোমান্টিক পরিবেশে স্বর্ণ আমাকে শুধু পাগল, ডাক্তার, চিকিৎসা ইত্যাদির কথা বলে যেতে লাগল। আমিও শুনে গেলাম মুখ শুকনো করে।

নিলয়দার বাড়িতে এসে পৌঁছোবার আগেই বৃষ্টি ধরে এল। বর্গির মতো বৃষ্টি। কলিং বেলে হাত দেওয়ার সময় আমার হাত কাঁপছিল। নিলয়দার সঙ্গে জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরে বেড়ানো এক জিনিস আর বাড়ির মধ্যে একটা হিংস্র পাগলের সঙ্গে সময় কাটানো...

দরজা খুলে দিল নিলয়দা। তার ডান হাতে পাঞ্জাজোড়া একটা ব্যান্ডেজ। এক মুখ হেসে নিলয়দা বললেন, আরে নীলু, আয় আয়, তোর আর পাত্তাই নেই! আমি ভাবলাম অসুখে ভুগছিস, খবর নিতে পারিনি এর মধ্যে।

স্বর্ণ দাঁড়িয়ে ছিল একটু দূরে। নিলয়দা ওকে দেখতে পাননি। আমি বললাম, স্বর্ণ এসেছে।

নিলয়দা বলল, স্বর্ণ? কোথায়? স্বর্ণ, আমি তোমার ওপর খুব রেগে গেছি। এর মধ্যে একবারও আসোনি? তোমার দিদিরই-বা কী ব্যাপার বলো তো, সেই যে রাগ করে চলে গেল, তারপর আর একবারও আমার খবর নিল না? এ কী-রকম রাগ? আমি মরলাম কি বাঁচলাম, সে খবরও নেবেনা?

আমি জিজ্ঞেস করলাম, নিলয়দা, তোমার হাতে কী হয়েছে?

ও, এটা? রাঁধতে গিয়ে হাত পুড়িয়ে ফেলেছি! আরে, আমার কি রান্নার অভ্যেস আছে? তবে বিশেষ কিছু হয়নি।

আমি আড় চোখে স্বর্ণর দিকে তাকালাম। আমাদের দু’জনেরই ধারণা হয়েছিল, পাগলটা নিলয়দাকেও কামড়ে দিয়েছে। কী জানি, নিলয়দা সত্যি কথা বলছে কি না!

স্বর্ণ বলল, নিলয়দা, তুমিও তো আমাদের খবর নাওনি একবারও?

আরে, আমি তো ব্যস্ত ছিলাম। তাছাড়া খালি বাড়ি ছেড়ে যাই কী করে? এসো, ভেতরে এসো, তোমাদের আজ দারুণ সারপ্রাইজ দেব!

স্বর্ণ ব্যগ্রভাবে বলল, সে চলে গেছে?

না, যাবে কেন? যাকে দেখবে, সে একেবারে অন্য মানুষ। বেশি কিছু লাগে না, বুঝলে, একটু সহানুভূতি, একটু সেবা, একটু স্নেহের কথা...।

আমরা এগিয়ে এলাম উঠোনের দিকে। তারপরের দৃশ্য দেখে আমার চক্ষুস্থির।

পাগলের ঘরের দরজা খোলা। বারান্দায় একটা চেয়ারে সে বসে আছে, পরিষ্কার পাজামা আর গেঞ্জি পরা, কোলের ওপর একটা বই।

স্বর্ণ আমার একটা হাত চেপে ধরল। এই প্রথম আমি তার স্পর্শ পেলাম, সঙ্গে সঙ্গে খুবই সাহসী হয়ে উঠলাম আমি। পাগলটা যদি স্বর্ণকে আবার কামড়ে দিতে আসে, আমিও ওর ঘাড় ভেঙে দেব। স্বর্ণর কাছে স্টিলের ছাতা আছে, ওটাই ব্যবহার করতে হবে।

নিলয়দা দারুণ উৎফুল্ল ভাবে বলল, জানিস নীলু, তুই যে ওকে ভোলানাথ নাম দিয়েছিলি, সেই নামে ডাকলে ও দিব্যি সাড়া দেয়। মানুষ চিনতে পারে। দেখবি? এই যে ভোলানাথ, দেখো কারা এসেছে। নীলুকে চিনতে পারছ তো? নীলু, সেই যে দেখেছিলে, অনেক দিন পরে আবার এল!

ভোলানাথ জ্বল জ্বলে চোখে, ঠোঁট বাঁকিয়ে এক ধরনের হাসি দিয়ে বলল, এই যে নীলুবাবু, অনেক দিন আসেননি? কেমন আছেন, হাঃ হাঃ হাঃ। কেমন আছেন? আঃ? হাঃ হাঃ হাঃ!

ভোলানাথের গলার আওয়াজ ছিল ভরাট, গমগমে। এখন সেই আওয়াজ যেন জল মিশিয়ে কেউ পাতলা করে দিয়েছে। হাসিটাও অদ্ভুত রকমের নিষ্প্রাণ।

গর্বিত ভাবে নিলয়দা বলল, দেখলি তো? একদম নর্মাল! ভোলানাথ, স্বর্ণকে চিনতে পারছ তো, স্বর্ণ? আমার শ্যালিকা, ওকে নমস্কার করো।

স্বর্ণকে দেখে যেন খুবই লজ্জা পেয়ে গেল ভোলানাথ, মুখটা নিচু করে মেয়েলি গলায় বলল, নমস্কার।

দেখলি? দেখলি? ডাক্তাররা কিছু পারেনি, কোনও ডাক্তার ভরসা দেয়নি, শুধু আমার নিজের চেষ্টায় স্বর্ণ, দাঁড়িয়ে রইলে কেন, বসো!

আমি আরও চেয়ার আনছি। আমরা বারান্দায় বসে বৃষ্টি দেখছিলাম।

আরও দুটি চেয়ার এনে নিলয়দা জিজ্ঞেস করল, নীলু, তোর কাছে সিগারেট আছে? দে তো! ভোলানাথ, তুমি সিগারেট খাবে?

ভোলানাথ বলল, সিগারেট? অ্যাঁ? হ্যাঁ, সিগারেট! খাব! সিগারেট খাব! পান খাব।

এখন তো পান নেই। শুধু সিগারেটই খাও।

একটা সিগারেট নিলয়দা ভোলানাথের ঠোঁটে গুঁজে দিয়ে অতি সম্মানিত অতিথির মতো তিনটি দেশলাই কাঠি জ্বেলে সেটা ধরিয়ে দিল। তারপর বলল, ভোলানাথ বই-ও পড়তে পারে। শুনবি? ভোলানাথ এঁদের একটু বই পড়ে শোনাও তো।

ভোলানাথের ঠোঁটে সেই অদ্ভুত হাসিটা লেগেই আছে। সেইটা দুহাতে ধরে বলল, হ্যাঁ, পড়ব। বই পড়ব। হাঃ হাঃ হাঃ! আমি বই পড়তে জানি। হাঃ হাঃ হাঃ! এই যে রামায়ণ, আমি পড়ব, রাম বলিলেন, পম্পা সরোবরের কী আশ্চর্য শোভা, দেখো লক্ষ্মণ, এই যে বিশাল বনরাজি, যেন একের সঙ্গে একটা, বৃষ্টি পড়িতেছে, টুপটাপ টাপুর টাপুর টুপটাপ, পাঁচুবাবু ছাতা মাথায় দিয়ে চলে যাচ্ছেন। পাঁচুবাবুর একটা বাছুর আছে, সীতা সেই বাছুরটা ধরতে যাচ্ছে, যাচ্ছে তো যাচ্ছেই, আর বাছুরটা কাদার মধ্যে লাফিয়ে লাফিয়ে ছুটেছে, দেখো লক্ষ্মণ, পম্পা সরোবরের তীবে এখন সেই বাছুরটা–।

আমি হাসব না কাদব বুঝতে পারছি না। স্বর্ণ আঁচলে মুখ চাপা দিয়েছে, ফুলে ফুলে উঠছে তার শরীর।

নিলয়দা মুগ্ধভাবে তাকিয়ে আছে ভোলানাথের দিকে। ভোলানাথ হঠাৎ থেমে যেতেই সে বলল, হবে, হবে, আস্তে আস্তে। আজ তো অনেকটা ঠিক বলেছে, প্রথম সেন্টেন্স দুটো –।

বইটা সশব্দে বন্ধ করে মাটিতে ফেলে দিল ভোলানাথ। তারপর উঠে দাঁড়াল। সিগারেটটা ডান হাতের মুঠোর মধ্যে ধরে গাঁজার মতো টানতে টানতে, ঈষৎ টলতে টলতে সে চলে গেল বাথরুমের দিকে।

এবারে আমি স্বস্তির সঙ্গে আমার সিগারেটে টান দিলাম।

নিলয়দা আমার পিঠে একটা চাঁটি দিয়ে বলল, কী রে, মিরাকুলাস ইম্প্রুভমেন্ট না? বল?

আমি ফ্যাকাসে ভাবে বললাম, হ্যাঁ, অনেকটা উন্নতি হয়েছে।

ও এখন নিজে নিজে পোশাক বদলাতে পারে, খিদে পেলে খাবার চায়। বই পড়া অভ্যেস করছে। আমার ধারণা কি জানিস, কেউ ওর মনে দারুণ কোনও আঘাত দিয়েছে, সেই জন্য মাথাটা একেবারে বিগড়ে গিয়েছিল। বাই নেচার ও কিন্তু ভায়োলেন্ট নয় একেবারেই। পরশু দিন কী হয়েছে শুনবি?

বাথরুমের মধ্যে দু'বার প্রচণ্ড জোরে গলা খাঁকারির আওয়াজ শোনা গেল। আমরা চমকে উঠলাম।

নিলয়দা বললেন, ও কিছুনা ও। একটু বেশি গয়ের ওঠে। পরশু দিন কী হল শোন। আমি রান্না করছিলাম, বেরিয়ে এসে দেখি ভোলানাথ বাড়ির বাইরে চলে গেছে। আমি তো তক্ষুনি খুঁজতে বেরোলাম। ও অনেকটা ভাল হয়ে গেছে, এখন যদি রাস্তার লোক আবার মারধোর করে, তবে সব নষ্ট হয়ে যাবে! আমার মনের মধ্যে যে কী হচ্ছিল, তোদের কী করে বোঝাব! এক ঘণ্টা হেঁটে হেঁটে গোটা তল্লাটটা খুঁজে এলাম। তারপর ক্লান্ত হয়ে যখন

ফিরেছি তখন দেখি যে বাইরের দরজার পাশে ভোলানাথ বসে আছে। ঠিক বাড়ি চিনে ফিরে এসেছে। কতটা মায়া পড়ে গেছে তাহলে বোঝ।

আমার মনে পড়ে গেল ড. দত্তগুপ্তর কথা। উনিও এই রকমই হবে বলেছিলেন। আমি একটা দীর্ঘশ্বাস গোপন করলাম।

স্বর্ণ জিজ্ঞেস করল, নিলয়দা, তুমি কি ওকে এখানেই রাখবে ঠিক করেছ?

একটু ইতস্তত করে নিলয়দা বলল, এখানে না রেখে ওকে কোথায় পাঠাব? কোনও হাসপাতালে তো নিতে চাইছে না। অনেক খোঁজখবর করলাম। হাসপাতালে ভর্তি করতে হলে নিকট আত্মীয়ের সই লাগে। মহা মুশকিল। তাছাড়া, আমি নিজে ওকে নিয়ে একটা এক্সপেরিমেন্ট করছি। আমি নিজেই যদি ওকে পুরোপুরি সারিয়ে তুলতে পারি, তাহলে কী বিরাট একটা কাজ হবে বলে? অনেকটা এগিয়ে আমি এখন থেমে যেতে চাই না।

স্বর্ণ আবার বলল, নিলয়দা, তুমি আয়নায় নিজের চেহারাটা দেখেছ? চোখের নিচে কালি, কণ্ঠার হাড় বেরিয়ে গেছে, তুমি কতটা রোগা হয়ে গেছে জানো? তুমি ভাল করে ঘুমোও না নিশ্চয়ই।

এবারে আমিও তাকিয়ে দেখলাম, এই দু'সপ্তাহে নিলয়দা চেহারা খুব খারাপ হয়ে গেছে, ওকে বেশ রুগ্ন দেখাচ্ছে। মেয়েরাই এটা লক্ষ্য করে আগে।

নিলয়দা একটু ক্লান্ত ভাবে হেসে বললেন, হ্যাঁ, আমার শরীরটা বেশ খারাপ লাগছে ক'দিন। নিজের হাতে রেঁধে খাওয়া কি আমার পোষায়? এ-রকম ভাবে কত দিন চালাতে পারব! তোমার দিদিকে বলো, এত রাগ কীসের, আজই চলে আসুক। পাপুনের পড়াশুনোর ক্ষতি হচ্ছে।

দিদি বলে দিয়েছে, ওই লোকটা থাকলে দিদি কিছুতেই আর এ বাড়িতে আসবে না। তুমি তো জানো, দিদির জেদ কীরকম?

কিন্তু রূপা না এলে আমার চলবে কী করে? রূপাকে ছাড়া কি আমি জীবন কাটাতে পারি? সত্যি কথা বলছি তোমাকে স্বর্ণ, আমার খুবই কষ্ট হচ্ছে। রূপা আর পাপুনের কথা চিন্তা করেই রাত্তিরে আমার ঘুম আসে না।

প্রচণ্ড জোরে মেঘ ডেকে উঠল। আবার বৃষ্টি আসছে। তার আগেই উঠে পড়া উচিত। নিলয়দা একেবারে অবুঝের মতো কথা বলছে। রূপাবউদির দিকটা নিশ্চয়ই চিন্তা করা উচিত।

আমি বললাম, নিলয়দা, তুমি অফিস ছুটি নিয়ে ক'দিন এভাবে চালাবে। এই সব চিকিৎসা তো দু'এক মাসের ব্যাপার নয়। বউদিই-বা কত দিন বাইরে থাকবে?

তুই ঠিকই বলেছিস রে নীলু, সেকথাটাও ভাবতে হবে!

স্বর্ণ বলল, এক কাজ করো না, ওই লোকটাকে মাদার টেরিজার কাছে পাঠিয়ে দাও। মাদার টেরিজা তো নানা রকম অসুস্থ লোকদের আশ্রয় দেন।

হঠাৎ রেগে গেল নিলয়দা। গলা চড়িয়ে বলল, মাদার টেরেসার কাছে পাঠাব? কেন? কথাটা বলতে তোমার লজ্জা করল না? কলকাতা শহরের যত অসহায় রুগীদের দায়িত্ব মাদার টেরেসা একলা নেবেন, আর আমাদের কোনও দায়িত্ব নেই? মাদার টেরেসার ঘাড়ে সবাইকে চাপিয়ে দিয়ে আমরা হাত ধুয়ে ফেলে মজা দেখব?

স্বর্ণ বলল, তা বলছি না। মাদার টেরেজার একটা বড় প্রতিষ্ঠান আছে, সেখানে ভাল ব্যবস্থা হতে পারে। তুমি একলার চেষ্টায় কতটা পারবে! মনে করো রাস্তায় তুমি আর একদিন দেখলে আর একটা পাগলকে লোকে মারছে, তাকেও তুমি বাড়িতে নিয়ে আসবে?

দেখো স্বর্ণ, আলোচনার মধ্যে সব চেয়ে কুযুক্তি হল হাইপথেটিক্যাল একটা উদাহরণ দেওয়া!

আমি ঘাড় ঘুরিয়ে বাথরুমের দিকে তাকালাম। ভোলানাথ এত দেরি করছে কেন?

ঠিক তখুনি জোরে দরজা ঠেলে বেরিয়ে এল ভোলানাথ। তার গায়ে শুধু গেঞ্জি, পাজামাটা সে আর পরেনি। তার সেই মূর্তি দেখে আমরা তিন জনেই কয়েক মুহূর্ত চুপ। পর্যায়ক্রমে তিন জনের দিকে তাকিয়ে সে বলল, আমি তোমাকে চিনি না, তুমি আমাকে চেনো না। কেউ কারুকে চেনে না। এই হল সোজা কথা, ব্যাস।

নিলয়দা ত্বরিতে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, স্বর্ণ, তুমি বাড়ি চলে যাও। নীলু স্বর্ণকে নিয়ে যা, একটু বাড়ি পৌঁছে দে, যা, দেরি করিস না।

ভোলানাথের দিকে চোখ রেখে আমরা এক পা এক পা করে এগোতে লাগলাম সদর দরজার দিকে। আমি আর নিলয়দা স্বর্ণকে আড়াল করে আছি। ভোলানাথ কটমট করে আমাদের দিকে তাকাচ্ছে, কিন্তু এগিয়ে এল না। মাথাটা একটু একটু করে দোলাচ্ছে। হঠাৎ যে-কোনও মুহূর্তে যেন ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে।

সদর দরজার বাইরে পৌঁছে যাবার পর স্বর্ণ শুধু আর্ত গলায় 'নিলয়দা' বলেই থেমে গেল। নিলয়দা স্বর্ণর একটা হাত চেপে ধরে ব্যাকুল ভাবে বলল, স্বর্ণ, প্লিজ, তোমরা আমাকে আর দু'তিন দিন সময় দাও! ও ভাল হয়ে যাবে, নিশ্চয়ই ভাল হয়ে যাবে। যদি না হয়, তবে অন্য ব্যবস্থা করব কথা দিচ্ছি। তার আগে আর একটু সময় দাও আমাকে, আর তিন-চার দিন।

৫-৬. আর্টিস্ট কিংবা কবি

এরপর প্রত্যেক দিন আমি নিলয়দার কাছে গিয়ে দুতিন ঘণ্টা করে সময় কাটাচ্ছি। চতুর্থ দিনে নিলয়দা জিজ্ঞেস করল, এবার কী-রকম বুঝছিস, নীলু? সবাই যাদের নর্মাল ভাবে, সেই রকম অনেক লোকের মধ্যেও তো এ-রকম একটু আধটু অস্বাভাবিক ব্যাপার থাকেই। থাকে না?

আমি বললাম, তা ঠিক।

অনেক আর্টিস্ট কিংবা কবিও তো আধপাগলা হয়!

ভোলানাথ সত্যিই অনেকটা বদলে গেছে। এখন ওকে আর ভয় পাবার কিছু নেই।

ও তো এখন একটা শিশু! একটু ধমক দিলেই কাঁদে। ওই যে মাঝে মাঝে মাধুরী মাধুরী বলে ওঠেনা? আমার মনে হয় মাধুরী নামের কোনও মেয়ের জন্যই ওর এই রকম অবস্থা হয়েছে। সেই মাধুরীকে যদি পাওয়া যেত! কাগজে তো বিজ্ঞাপন দিলাম, কেউ সাড়া দিল না।

বসবার ঘরের সোফাতেই কাৎ হয়ে শুয়ে ঘুমিয়ে আছে ভোলানাথ। এখন তাকে ঘরের মধ্যে আটকে রাখা হয় না। সে যেখানে ইচ্ছে যেতে পারে। ভোলানাথের একটা গুণ আছে অন্তত, সে কোনও জিনিসপত্র ভাঙে না।

এই ক'দিন ভোলানাথ একেবারে গুম হয়ে আছে। কথা প্রায় বলেই না। নিলয়দা ওকে বেশিক্ষণ ধরে কিছু বোঝবার চেষ্টা করলে ও ঝরঝর করে কেঁদে ফেলে। অত বড় একটা জোয়ান পুরুষমানুষের কান্না দেখলে যেন কেমন কেমন লাগে। আমি কোথায় যেন পড়েছিলাম, পাগলদের সব সময় চোখ শুকনো থাকে, কান্না জিনিসটা তো তীব্র অনুভূতির ব্যাপার। তবে কি ভোলানাথ সুস্থ হয়েই গেল?

নিলয়দা এক জন নামকরা সাইকিয়াট্রিস্টকে ডেকে এনেছিলেন দু'দিন। তার নাম ড. জগন্নাথ ভড়। ভদ্রলোক বেশ সহানুভূতিশীল, দ্বিতীয় দিন তিনি নিলয়দার কাছ থেকে টাকা নিতে চাননি। ড. ভড় বলেছেন যে, এই ধরনের পাগলরা মাঝে মাঝে দু'চার দিনের জন্য খানিকটা স্বাভাবিক হলেও আবার হঠাৎ এই রোগ রিলাপস করে। দীর্ঘস্থায়ী ট্রিটমেন্টে কোনও ফল পাওয়া যেতে পারে। নিলয়দার পক্ষে বাড়িতে রেখে এ-ভাবে ওর চিকিৎসা চালিয়ে যাবার কোনও মানেই হয় না।

ড. ভড় দু'টি পরামর্শ দিলেন। পুরুলিয়ার কোনও এক সেবা কেন্দ্রে এক জন ডেনিশ চিকিৎসক আছেন। তিনি এই ধরনের রোগের চিকিৎসার জন্য জগৎবিখ্যাত। এখন প্র্যাকটিস ছেড়ে তিনি সন্ন্যাসী হয়ে পুরুলিয়ার গরিবদের জন্য কাজ করছেন। তার কাছে নিয়ে গিয়ে একবার চেষ্টা করে দেখা যেতে পারে।

আর একটি হল, পুলিশের ওপরমহলে যদি জানাশুনো থাকে তবে সে-রকম এক জনকে ধরে পুলিশের হাতে ভোলানাথকে তুলে দেওয়াই সব চেয়ে ভাল। কোনও কোনও জেলখানায় পাগলদের রাখার ব্যবস্থা আছে। পুলিশের ওপরমহলে আমাদের কোনও চেনাশুনো নেই। সেকথা শুনে ড. ভড় বলেছিলেন যে, এক জন ডিআইজি তার বিশেষ বন্ধু। তিনি নিজেই সেই ডিআইজি-কে অনুরোধ করে দু'এক দিনের মধ্যেই ওকে সরাবার ব্যবস্থা করে দেবেন।

পুলিশের কোনও লোক এখনও আসেনি। নিলয়দা পুরুলিয়ার সেই ডেনিশ ডাক্তারের কাছে চিঠি লিখেছেন। তার অবশ্য উত্তর আসবার সময় হয়নি, কিন্তু আজ চতুর্থ দিন।

এর মধ্যে একদিন আমাকে এখানে বসিয়ে রেখে নিলয়দা রূপাবউদির সঙ্গে দেখা করে এসেছে। ওদের অনেকটা মিটমাট হয়ে গেছে, কিন্তু রূপাবউদি জেদ থেকে টলেনি, এই পাগল যতক্ষণ থাকবে ততক্ষণ সে এ বাড়িতে ফিরবে না। আর নিলয়দা যে তিন চার দিন সময় চেয়েছিল স্বর্ণর কাছে, সেই কথা তাকে রাখতে হবে।

নিলয়দা বলল, তুই একটা কাজ করতে পারবি, নীলু? তুই রূপাদের বাড়ি চলে যা। রূপাকে একটু বুঝিয়ে বল যে, ভোলানাথ সত্যিই প্রায় ভাল হয়ে গেছে। কাল আমি ওকে নিয়ে রাস্তায় বেরিয়েছিলাম, হেঁটে হেঁটে ঘুরে এলাম গিরিশ পার্ক পর্যন্ত, একবারও একটুও গণ্ডগোল করেনি!

নিলয়দা, এ-সবকথা রূপাবউদিকে বলে কোনও লাভ হবে না। তার থেকে আমি যা বলেছিলাম, সেটাই করো।

আমার আর দু'দিন অফিস ছুটি আছে। এ দুদিন রেখে যদি আর একটু চেষ্টা করতে পারি...।

রূপাবউদির কাছ থেকে তুমি চার দিন সময় চেয়ে নিয়েছিলে– ।

ড. ভড় যে বলেছিলেন তার কোনও এক ডিআইজি বন্ধুকে বলে পুলিশ পাঠাবেন।

পাঠালেন না, তা তো দেখাই যাচ্ছে। নিলয়দা অনেক রকম ভাবে তো চেষ্টা করা হল। এখন দু'চার দিন রূপাবউদিকে শান্ত করাই তোমার পক্ষে বেশি দরকার। ভোলানাথকে আমি নিয়ে যাচ্ছি, ও সেখানে ভালই থাকবে।

নিলয়দা একটুক্ষণ চুপ করে থেকে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলল, চল তা হলে, আর দেরি করে লাভ নেই!

ভোলানাথকে জাগিয়ে নিলয়দা বলল, চলো ভোলানাথ, আমরা এক জায়গায় যাব। জামাটা পরে নাও!

অত্যন্ত বাধ্য ছেলের মতো ভোলনাথ পাশের ঘরে গিয়ে জামা পরে এল।

নিলয়দা ওপর থেকে নিয়ে এল একটা ছোট সুটকেস। নিজেরই আর দুটো পাজামা আর পাঞ্জাবি আর গেঞ্জি-টেঞ্জি ভরে এনেছে। বাথরুম থেকে নিয়ে এল তোয়ালে আর সাবান। সব গুছিয়ে টুছিয়ে বলল, রাস্তা থেকে টুথপেস্ট আর টুথব্রাশ কিনে নিতে হবে।

ভোলানাথকে বলল, আমার এই চটি পরে নাও, আর চুলটা একটু আঁচড়ে এসো তো।

ভোলানাথ চটি পরল না, একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল নিলয়দার দিকে।

নিলয়দা আবার মিষ্টি করে বলল, পরে নাও চটি! বাইরে বেরুবার সময় একটু সেজেগুজে বেরুতে হয়। আমি তোমার চুল আঁচড়ে দিচ্ছি, শিখে নাও, এইভাবে রোজ চুল আঁচড়াবে।

ভোলানাথ যদিও নিলয়দার চেয়ে বয়েসে বড়, তবু নিলয়দা এমন যত্ন করে তার চুল আঁচড়ে দিলেন যেন নিজের ছেলে পাপুনকে বাইরে বেড়াতে নিয়ে যাবার জন্য সাজিয়ে দিচ্ছেন।

ট্যাক্সি নিয়ে আমরা চলে এলাম কালীঘাট। মলয়া বোর্ডিংহাউসের মালিক হরিবাবুর সঙ্গে আমার আগেই কথা বলা ছিল। ঘরটাও আমি সকালে এসে দেখে গেছি। তিন তলার এক কোণে ছোট সিঙ্গল সিটেড রুম। ভাড়া দৈনিক হিসেবে আঠারো টাকা। মাসিক হিসেবে সাড়ে তিনশো।

হরিবাবুর কাছে আমি সত্য গোপন করিনি। আমি তাকে আগেই জানিয়ে দিয়েছি যে, যাকে এখানে আমরা রাখব, তার একটু মাথার গোলমাল আছে। তবে নিরীহ পাগল, কারও কোনও ক্ষতি করবে না, বোর্ডিং হাউসে মেয়েরা আসে না, বাইরে নোটিশ দেওয়া আছে যে, বোর্ডাররা কেউ নিজেদের ঘরে কোনও আত্মীয়াকেও নিয়ে যেতে পারবে না, সেই জন্যই আমি ও-কথা বলেছি। হরিবাবু রাজি হয়েছেন। হেসে আমাকে বলেছিলেন, আরে ভাই হোটেলের ব্যবসা খুলেছি, যত পাগলদের নিয়েই তো আমার কারবার। টাকাটা অ্যাডভান্স দিয়ে যাবেন।

হরিবাবু সমেত আমরা উঠে এলাম তিন তলায়। হরিবাবু ভোলানাথকে বেশ কয়েক বার দেখে নিয়ে আমার দিকে চোখ বুজে একটা ভুরুর ইঙ্গিত করলেন। অর্থাৎ চলে যাবে।

নিলয়দা বলল, আপনি কারুকে দিয়ে ওর ঘরে খাবার পাঠাবার ব্যবস্থা করতে পারবেন? ও ঘরেই থাকবে, বাইরে বেরুতে বিশেষ পছন্দ করে না।

আমি বললাম, যদি বাইরে বেরুতে চায়, তাহলে বাধা দেবার দরকার নেই।

হবিবাবু বললেন, সে-সব আমি দেখব। আপনারা ছেড়ে দিন না আমার ওপর। কোনও চিন্তা করবেন না। সব ঠিকঠাক থাকবে।

হরিবাবুর কাছ থেকে এ-রকম সহযোগিতার আশ্বাস পেয়ে নিলয়দা বেশ নিশ্চিন্ত হল। এতক্ষণ ওর মুখখানা বিষণ্ণ ছিল, এবারে হাসি ফুটল। আমার দিকে তাকিয়ে বলল, ঘরটা একটু ছোট হলেও বেশ খোলামেলা।

হরিবাবু বললেন, দক্ষিণ খোলা, সেই জন্য এ-ঘরের রেট বেশি। কিন্তু আপনাদের কাছ থেকে বেশি নিইনি!

নিচ থেকে কেউ হরিবাবুকে ডাকতেই তিনি যাবার জন্য উদ্যত হয়ে আমাকে বললে, তাহলে সব ঠিকআছে? যদি বেগড়বাঁই করে, ঘুমের ওষুধ খাইয়ে দেব। এসব কেসে যত ঘুম পাড়িয়ে রাখবেন, ততই উবগার!

ভোলানাথ এ পর্যন্ত একটিও কথা বলেনি। তবে, পর্যায়ক্রমে আমাদের মুখের দিকে তাকিয়ে সব কথা শুনছে। নিলয়দা তাকে কাঁধে হাত দিয়ে বলল, ভোলানাথ, তোমাকে কয়েকটা দিন এখানে থাকতে হবে, বুঝলে? তারপর আমরা পুরুলিয়ায় বেড়াতে যাব। কেমন?

ভোলনাথ নিঃশব্দে চেয়ে রইল শুধু। যেন সে কথা বলতে ভুলে গেছে।

আমি বললাম, চলো, তোমাকে বাথরুমটা দেখিয়ে দিই। খুব সুবিধে আছে, পাশেই বাথরুম। যদি হাওয়া খাওয়ার ইচ্ছে হয় ছাদে ঘুরে বেড়াতে পারো। কাল সকালেই তো আমরা আসছি। যদি কিছু দরকার হয় তো বলবে!

ভোলানাথ কোনও কথা বলবে না ঠিক করেছে। আমার সঙ্গে উঠে গিয়ে বাথরুম দেখল, ছাদে ঘুরে এল কিন্তু মুখে টুঁ শব্দটি নেই।

নিলয়দা ওর বিছানাটা ঝেড়েঝুড়ে পরিষ্কার করে দিল। সুটকেস খুলে পাজামা-পাঞ্জাবি বার করে ঝুলিয়ে দিল আলনায়। ঘরটা দেখে আমারই লোভ হল বেশ। এ-রকম একটা ছোট্ট ঘরে একলা থাকতে পারলে আমি বর্তে যেতাম।

বিদায় নেবার সময় নিলয়দা বলল, তাহলে যাই? লক্ষ্মী হয়ে থাকবে কিন্তু? অ্যাঁ? কয়েক দিন পরেই আমরা পুরুলিয়া বেড়াতে যাব।

ভোলানাথের দু'চোখ দিয়ে দু' ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ল। তা দেখে নিলয়দাও কেঁদে ফেলতে যাচ্ছিল, আমি ওর হাত ধরে তাড়াতাড়ি টেনে নিয়ে এলাম ঘরের বাইরে।

বাস স্টপে দাঁড়িয়ে নিলয়দা বলল, ও আমার ওপর অভিমান করেছে।

আমি বললাম, যদি ওর অভিমান হয়, যদি ও সব বুঝতে পারে, তবে তার চেয়ে আনন্দের কথা তো আর নেই!

ও তো সুস্থই হয়ে গেছে রে!

আমার মনে হয়, নিলয়দা, ওকে এবারে মনে আঘাত দিয়ে দিয়ে কিছু কথা বলা উচিত আমাদের। ও যদি কাঁদে, চোখের জলের চেয়ে ভাল চিকিৎসা আর নেই। বাস এসে গেছে, তুমি উঠে পড়ো।

তুই আমার সঙ্গে যাবিনা? চল, ট্যাক্সি নিচ্ছি, রূপাদের তুলে নিই, তারপর বসে বাড়িতে আড্ডা দেওয়া যাবে।

না নিলয়দা, রূপাবউদির সঙ্গে অনেক দিন বাদে তুমি এক সঙ্গে থাকবে, এই সময় স্বামী-স্ত্রীর মাঝখানে তৃতীয় ব্যক্তির থাকা উচিত নয়। এখন তোমাদের নিজস্ব অনেক কথা আছে।

আসলে কি জানিস, রূপা যদি আমায় বেশি বকুনি দেয়, সেই ভয় পাচ্ছি। তবু, তুই থাকলে– অবশ্য তোকেও রূপা বকতে ছাড়ে না।

আজ তুমি একলাই রূপাবউদির বকুনি খাও!

নিলয়দা ঘাড় ঘুড়িয়ে মলয়া বোর্ডিং হাউসের দিকে তাকাল। এখান থেকে ভোলানাথের ঘরটা দেখা যায় না। তবে ছাদের পাঁচিল ধরে কে যেন দাঁড়িয়ে আছে, ভোলানাথ হতেও পারে।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, নিলয়দা, তুমি সাত্যকি বসুমল্লিক বলে কারুকে চেনো?

না তো! সে কে? কী করে?

খুব বড়লোক।

খুব বড়লোক? আর কিছু, মানে কীসে তিনি বিখ্যাত?

সে-রকম কিছু জানি না।

শুধু এক জন বড়লোক, তাকে আমি চিনতে যাব কেন? হঠাৎ এর কথা তুই জিজ্ঞেস করলি যে?

আমার মনে হয়, ওই সাত্যকি বসুমল্লিক একটা বদ্ধ পাগল, কিন্তু সে-কথা কেউ জানে না, সুস্থ সেজে বহু লোকের মাথার পর কেবল ছড়ি ঘোরাচ্ছে!

.

০৬.

শিয়ালদার কাছে প্রচুর সস্তার হোটেল-বোর্ডিং থাকলেও অনেক ভেবেচিন্তেই ভোলানাথকে সেখানে রাখা হয়নি। শিয়ালদা থেকে নিলয়দার বাড়ি বেশি দূর নয়। কালীঘাট থেকে ভোলানাথের পক্ষে রাস্তা চিনে নিলয়দার বাড়ি যাওয়া শক্ত হবে। স্বর্ণর কথা শুনে আমি বুঝেছিলাম, এখন কিছুদিন ভোলানাথকে দূরে সরিয়ে রাখা বিশেষ দরকার। নইলে নিলয়দার দাম্পত্যজীবন নষ্ট হয়ে যাবে একেবারে।

মলয়া বোর্ডিং আমার বাড়ি থেকে কাছেই, সেই জন্য আমি নিলয়দাকে বলেছিলাম সকালে এসে আমিই খোঁজখবর নেব, নিলয়দাকে আসতে হবে না।

সকালে ঘুম থেকে উঠেই দেখলাম বৃষ্টি হচ্ছে। আমি বৃষ্টি-প্রেমিক। মনটা ভাল হয়ে গেল। চোখ-মুখ না ধুয়েই জানলার কাছে দাঁড়িয়ে রইলাম অনেকক্ষণ। বৃষ্টির সময় প্রত্যেকটা বাড়িকেই ঠিক গাছের মতো গভীর দেখায়। তবে গাছের সঙ্গে তফাৎ হচ্ছে এই, প্রত্যেকটি বাড়িরই একটা গল্প আছে।

আমার খবরের কাগজ পড়ার নেশা নেই, অন্য দিন যাও-বা একটু উলটে-পালটে দেখা আজ আর ছুঁলামই না। মায়ের কাছে আবদার করে দ্বিতীয় কাপ চা আদায় করে ফিরে এলাম বিছানায়। বৃষ্টি থামবার লক্ষণ নেই।

এখন শুয়ে শুয়ে একটা কবিতার বই পড়লে কেমন হয়? কিন্তু মনে মনে দায়িত্বটা খচ্ খচ্ করছে। সত্যি কথা বলতে কি, এই রকম একটা সকাল এক জন পাগলের সঙ্গে কাটাতে আমরা একটুও ইচ্ছে করছে না। না গেলে কী হয়? বৃষ্টি যদি আর বাড়ে, রাস্তায় জল জমে

ট্রাফিক বন্ধ হয়ে যায়, তবুও যেতে হবে? যা ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়েছে, তাতে ভোলানাথ ভালই থাকবে।

কিন্তু আমি তো আর সাত্যকি বসুমল্লিক হয়ে জন্মাইনি যে ইচ্ছেমতো যে-কোনও সকাল বিছানায় গড়িয়ে কাটিয়ে দিতে পারব! একটু বাদেই মা এসে জিজ্ঞেস করল, কী রে তুই এখনো শুয়ে আছিস যে, বাজারে যাবি না?

বাড়ির বেকার ছেলে হিসেবে বাজার করার ভারটা আমারই ওপর। ইদানীং দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির কারণে আমাদের বাড়িতে এক দিন অন্তর বাজার হয়। তাতে আমার খানিকটা ক্ষতিই হয়েছে, কারণ বাজারের পয়সা থেকেই আমার হাত-খরচ তুলতে হয়।

বাথরুমে ঢুকতে যাচ্ছি, দাদা বলল, দাঁড়া, আগে আমি যাব।

তারপর ঘুরে দাঁড়িয়ে দাদা কড়া গলায় জিজ্ঞেস করলো, এই নীলু, তুই আমার ব্লেড নিয়েছিস?

আমি সরাসরি উত্তর না দিয়ে বললাম, তোমার ব্লেড? কবে?

আমার একটাই মাত্র ব্লেড ছিল, তুই না নিলে আর কে নেবে? সকালে দাড়ি কামাতে গিয়ে দেখি আমার ব্লেড নেই, এমন বিরক্ত লাগে!

গলা একটু নরম করে দাদা আবার বলল, না বলে নিস কেন? চাইলেই পারিস? চাইলে কি আমি দিইনা?

দাদা বিদেশি ব্লেড ব্যবহার করে। এই ব্লেডের ব্যাপারে দাদা খুব কৃপণ।

আমি ব্লেড চাইলে দাদা একটা আধুলি দিয়ে বলে, তোর ব্লেড কিনে নিস! নিজেরটা কিছুতেই দেবে না। কেন, আমার বুঝি কখনও বিদেশি ব্লেডে মসৃণ ভাবে দাড়ি কামাতে ইচ্ছে হতে পারে না?

ছাতা আর থলে নিয়ে বাইরে বেরিয়ে পড়লাম। দাদার কথায় মনটা খিঁচড়ে গেছে, আজ বাজারের পয়সা বেশি করে সরাতে হবে। সাত্যকি বসুমল্লিক বলেছিলেন, আমরা মতো একটা ছেলেকেই তিনি খুঁজছেন। কী কাজ তিনি দিতে চেয়েছিলেন আমাকে?

হঠাৎ মনে হল, আমি যদি পাগল হয়ে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াতাম, আর নিলয়দার মতো এক জন লোক আমাকে রাস্তা থেকে তুলে নিয়ে গিয়ে মলয়া বোর্ডিং হাউজের তিন তলার ছোট ঘরটায় রেখে দিত, তাহলে অপূর্ব আনন্দে আমি দিন কাটাতে পারতাম। সারা দিন বই পড়তাম শুয়ে শুয়ে, মাঝে মাঝে বেসুরো গান গাইতাম, আপন মনে হাসতাম কিংবা কাঁদতাম, এর থেকে আর বেশি কী চাই।

কিন্তু নিলয়দার মতো লোক একটাই হয়। ভোলানাথ যে সুযোগ পেয়েছে, সে-সুযোগ আর কেউ পাবেনা।

সঙ্গে সঙ্গেই আমার চোখ গেল রাস্তার মাঝখানে ট্রামলাইনের পাশেই দাঁড়িয়ে আছে এক পাগলি। একে আমি আগেও মাঝে মাঝে দেখেছি। মোটাসোটা চেহারা, মাঝবয়সী। কোমরে একটা ছেঁড়া গামছা জড়ানো, কিন্তু তাতে কিছুই লজ্জা নিবারণ হয়নি, উলঙ্গই বলা চলে কিন্তু তার শরীরের চর্বির পরতে পরতে জমে আছে ময়লা, মাথার চুল ছোট ছোট করে ছাঁটা, কেউ বোধহয় তাকে জোর করে একবার ন্যাড়া করে দিয়েছিল। পাগলি একটু অদ্ভুত ভাবে বেঁকে দাঁড়িয়ে আছে, তার হাতে একটা অ্যালুমিনিয়ামের সাকি, সেটা সে এমন ভাবে উঁচিয়ে ধরে আছে, যেন যে-কোনও মুহূর্তে কারুর দিকে ছুঁড়ে মারবে।

আগে রাস্তা-ঘাটে পাগল-টাগল দেখলেই আমি অনেক দূরে সরে যেতাম। আজ একটুক্ষণ দাঁড়িয়ে দেখলাম পাগলিকে। এরা কোথা থেকে আসে, কোথায় যায়? কে এদের ছেড়ে দেয় শহরের রাজপথে?

বৃষ্টির তেজ কমে এসেছে, রাস্তায় বেরিয়ে পড়েছে অনেক মানুষ, অফিসযাত্রীদের ভিড় শুরু হয়ে গেছে। গাড়ি, ট্যাক্সি, রিক্সা, ট্রাম, বাস সব ভর্তি। এই যে এত মানুষ যাচ্ছে, এরা নিশ্চয়ই ভারতীয় ঐতিহ্য, বাংলার সংস্কৃতি, রবীন্দ্রসঙ্গীত, অপসংস্কৃতি, গণতান্ত্রিক

অধিকার, শ্রেণীহীন সমাজ, মানবতা, বিশ্বমানবতা, বিশ্বশান্তি, নারী-পুরুষের সমান অধিকার ইত্যাদি নিয়ে কিছু না-কিছু চিন্তা করে। কিন্তু সকালবেলা প্রকাশ্য রাস্তায় প্রায় উলঙ্গ এক জন রমণীকে দেখে, কেউ কোনও ভ্রূক্ষেপও করছে না।

আমিও এই পাগলির জন্য কিছুই করতে পারব না। কিন্তু আমি যদি নিলয়দাকে সাহায্য না করি, তাহলে মানুষ হিসেবে আমি খুবই ছোট হয়ে যাব। তাড়াতাড়ি বাজারটা সেরেই আমি ছুটলাম কালীঘাটের দিকে।

আগে এক তলার অফিস ঘরে ঢুকে হরিবাবুর কাছে খোঁজ নেব ভেবেছিলাম, কিন্তু তিনি নেই। সন্তর্পণে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে লাগলাম ওপরে।

ভোলানাথের ঘরের দরজাটার এক পাল্লা খোলা, জানালার ধারে বাইরের দিকে চেয়ে সে দাঁড়িয়ে আছে। আমি ঘরের মধ্যে ঢুকে এলেও সে মুখ ফেরাল না।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, কেমন আছ, ভোলনাথ? রাত্তিরে কোনও অসুবিধে হয়নি তো?

ভোলানাথ আমার চেয়ে বয়েসে অনেক বড় হলেও আমি তাকে তুমি বলতে শুরু করেছি। পাগল মানেই তো শিশু।

ভোলানাথ মুখ ফিরিয়ে আমার আপাদমস্তক দেখল। তারপর জল-মেশানো পাতলা গলায় বললে, মেঘ করলে আমার কষ্ট হয়, মাথায় ব্যথা করে, খুব ব্যথা করে! আকাশে এত মেঘ!

যে-কেউ এখন শুনলে ভাববে ভোলানাথ সুস্থ লোকের মতো কথা বলছে। গত চার দিন সে একটাও কথা বলেনি। তবু ভোলানাথের এই স্বাভাবিকতাতেও আমার একটু গা ছম ছম করে।

খাট ছাড়া ঘরে একটি মাত্র চেয়ার আছে। তাতে বসে আমি বললাম, বৃষ্টি শুরু হয়েছে তো, মেঘ এবারে কেটে যাবে।

ভোলানাথ আমার দিকে হাত বাড়িয়ে বললো, সিগারেট?

আমি একটা সিগারেট আর দেশলাই এগিয়ে দিলাম ওর দিকে। নিলয়দার মতো ওর সিগারেট জ্বালিয়ে দিলাম না। দেখা গেল ভোলানাথ ইচ্ছে করলে দিব্যি নিজের সিগারেট ধরাতে পারে। পোড়া কাঠিটা তার হাত থেকে মেঝেতে পড়ে গিয়েছিল, সেটা তুলে নিয়ে সে ফেলে দিল জানলা দিয়ে।

তোমার খাওয়া-দাওয়ার কোনও অসুবিধে হয়নি তো? রাত্তিরে খেয়েছ ভাল করে? সকালে চা দিয়েছে?

ভোলানাথ সোজাসুজি আমার চোখের দিকে তাকিয়ে বললে, একটা বাড়ি আগুনে পুড়ে গেল, কেউ দেখেনি, তবু পুড়ে গেল, সেই বাড়ির মানুষ যন্ত্রণায় ছটফট করতে লাগল, তবু কেউ কারুকে কিছু বলে না। প্রত্যেকেই মনে মনে অন্যকে দোষ দেয়। আমি বললাম, আগুন-লাগা বাড়িতে থাকতে নেই, কেউ শুনল না।

আমি সচকিত হয়ে বললাম, আগুন লেগেছিল? কার বাড়িতে? তোমার বাড়িতে?

অনেক বাড়িতে আগুন লাগে, কেউ দেখে না।

তোমার বাড়ি কোথায় ছিল, ভোলানাথ?

হাত পোড়ে না, পা পোড়ে না, তবু আগুন জ্বলতেই থাকে! জ্বলতেই থাকে।

আমি আগেও এটা লক্ষ্য করেছি যে, ভোলানাথ যখন অনেকটা স্বাভাবিক ভাবে কথা বলে, তখনও সে কোনও প্রশ্নের উত্তর দেয় না। নিজের কথাটাই শুধু বলে। তবু আমার মনে হল, ভোলানাথ যেন স্মৃতিচারণ করতে শুরু করেছে। মানুষের স্মৃতি যে কত দামি তা কোনও পাগলের সংস্পর্শে এলেই ভাল করে বোঝা যায়। স্মৃতির অভাবেই তো ওদের এত কষ্ট।

কোনক্রমে যদি ওর পূর্ব পরিচয় কিংবা বাড়ি-টাড়ির সন্ধান পাওয়া যায় সেই জন্য আমি আবার জিজ্ঞেস করলাম, ভোলানাথ, তোমার বাড়ি কোথায় ছিল? মনে পড়ছে? আগুন লেগেছিল সেই বাড়িতে? কে কে ছিল তোমার?

ভোলানাথ বলল, বাদলা পোকা। বাদলা পোকা!

কী বলছ?

বাদলা পাকা যেমন আগুনে ঝাঁপ দেয়, অনেক মানুষও ইচ্ছে করে আগুনে ঝাঁপ দেয়। নিজেরা কিন্তু কিছুই জানে না। কী যে পুড়ে যাচ্ছে তা-ও জানে না! হাঃ হাঃ হাঃ!

আমি চুপ করে গেলাম। এ তো অন্য রকম আগুনের কথা বলছে। পাগল হবার আগে ভোলানাথ বোধহয় খুব একটা সাধারণ মানুষ ছিল না। এক ধরনের উপলব্ধি না থাকলে তো মানুষ এ-রকম কথা বলতে পারে না।

হাতের সিগারেটটা চোখের সামনে ধরে ভোলানাথ আবার বলল, এই যে সিগারেটটা নিজে নিজে পুড়ছে, মানুষও এই ভাবে নিজে নিজে পোড়ে। কিন্তু বোঝা যায় না। বাইরে থেকে দেখো, সব ঠিক আছে, চেহারা ঠিক আছে, বুকের লোম ঠিক আছে, ধুৎ!

জ্বলন্ত সিগারেটটা সে প্রচণ্ড জোরে ছুঁড়ে ফেলল মাটিতে। তারপর আমার দিকে চেয়ে লাজুকের মতো হাসল।

আমি জুতো দিয়ে ওর সিগারেটের আগুনটা নিভিয়ে দিলাম। এক জন মানুষ আমার সামনে বসে সুস্থ লোকের মতো কথা বলে যাচ্ছে, অথচ আমার কোনও প্রশ্নের সে উত্তর দেবে না। আমার সঙ্গে কোনও রকম মানসিক সংযোগ হবে না। এটা যে কত কষ্টকর তা যার অভিজ্ঞতা নেই সে বুঝবে না। পাগলের সঙ্গে কথা বলতে গেলে বোধহয় স্পেশাল কিছু ট্রেনিং লাগে। আমার তা নেই, সুতরাং আমি চুপ করে থাকাই ঠিক করলাম।

ভোলানাথ বললে, নদী নেই একটাও! কোথায় নদী? মানুষ নদীতে স্নান করে, পুকুরে স্নান করে, পাতকুয়োয়, না, পাতকুয়োয় না খালে, আর সমুদ্রে, আর নদীতে স্নান করে, খুবস্নান করে, ডুব দিয়ে দিয়ে স্নান করে, নাক টিপেজলের মধ্যে ডুব দেয়, কিনারা ছেড়ে মাঝখানে চলে যায়, সবসময় বুকটা জ্বলে যাচ্ছে কিনা! জুড়োতে হবে তো! তারপর ধরো তোমার...ইয়ে...ধরো তালগাছ। তালগাছ লম্বা হয় বলে কি তুমিও তার সমান লম্বা হতে পারবে? পারবে না! তবু শুধুমুদু যাওয়া কেন? তারপর ধরো ঘড়ি। এই ইয়ে তোমার ঘড়ি প্রত্যেক ঘণ্টায় বাজে বলে তুমিও ঘণ্টায় ঘণ্টায় বাজবে? অ্যাঁ? ঘড়িতে দম দিতে হয় বলে তুমিও নিজে দম দিচ্ছ, মোচড় মোচড় করে দম দিচ্ছ। আরে বাবা, দম দিলেই কি সব জিনিস বাজে? অত সহজ নয়, অ্যাঁ? তারপর ধরো, সিঁড়ি! ওদের বাড়ির সিঁড়িটা ভেঙে গেল বলে তুমিও তোমার নিজের বাড়ির সিঁড়ি ইচ্ছে করে ভেঙে ফেলবে? অ্যাঁ?

আমি আর না থাকতে পেরে বলে উঠলাম, কার বাড়ি ভোলানাথ? কোন বাড়ির সিঁড়ি ভেঙে গেছে?

ভোলানাথ চেঁচিয়ে উঠলো, কে?

দরজা ঠেলে ঢুকল নিলয়দা। আমার ওপর ভরসা করতে পারেনি। সকালেই চলে এসেছে। আমাকে দেখে একটু লজ্জা পেয়ে বলল, সকাল থেকেই এত বৃষ্টি, ভাবলাম তুই আসতে পারবি না। সাউথে এতটা নয় দেখছি, নর্থে তো সাঙ্ঘাতিক বৃষ্টি হচ্ছে! কেমন আছ, ভোলানাথ।

ভোলানাথ বলল, হ্যাঁ, বৃষ্টি হলে মেঘ কেটে যায়! মেঘ ভাল না বৃষ্টি ভাল।

নিলয়দার হাতে এক প্যাকেট সন্দেশ। বেশ উৎফুল্ল গলায় বলল, কোনও গণ্ডগোল হয়নি, সব ঠিকঠাকই তো আছে, না রে নীলু? আমি রাত্তিরে একটা বিশ্রী স্বপ্ন দেখলাম।

প্যাকেটটা খুলে ভোলানাথের দিকে এগিয়ে সস্নেহে নিলয়দা বলল, খাও। আমাকে প্রায়ই ট্যুরে যেতে হয়। হোটেলে কী যে খাবার দেয়, আমি তো জানি! নীলু নে, তুই-ও নে।

ভোলানাথ এক সঙ্গে দুটো সন্দেশ নিয়ে মুখে ভরে দিল। তার ঠোঁট মাখামাখি হয়ে গেল সন্দেশের গুড়োয়। নিলয়দা পকেট থেকে রুমাল বার করে বলল, আরে, ও-ভাবে খায় না, একটা একটা করে খেতে হয়।

আমি উঠে দাঁড়িয়ে বললাম, নিলয়দা, তুমি যখন এসে গেছ, আমি তাহলে চলি! সব পারফেকটলি নর্মাল। ভোলানাথ এতক্ষণ আমাকে অনেক ভাল ভাল কথা শোনাচ্ছিল। একটা টেপ রেকর্ডার থাকলে বেশ হত!

রাস্তায় বেরিয়ে আমি উদ্দেশ্যহীন ভাবে হাঁটতে লাগলাম। ঝুরু ঝুরু বৃষ্টি পড়েই চলেছে। কিন্তু জলে জমেনি। এখন কোথাও গেলে হয়। কিন্তু কোথায় যাব, কার কাছে যাব? রানিদের বাড়িতে এই সময় যাওয়া যায় না। শুক্কুরবার সকাল দশটায় অন্য বন্ধুদেরও ব্যস্ত থাকে। এখন কফি হাউসে কেউ আসবেনা।

হঠাৎ আমার মনে হল, অনেক দিন সমুদ্রের ধারে যাইনি। গত এক বছরে কোথায় কোথায় গেছি? নেতারহাট, আগরতলা, দুবরাজপুর, মগমা, বাঁকুড়া থেকে মুকুটমণিপুর, কিন্তু সমুদ্রের দিকে তো যাওয়া হয়নি।

সমুদ্রের পাশে দাঁড়িয়ে বৃষ্টি দেখা...এক্ষুনি যাওয়া যায় না? ময়দান থেকে বাসে দিঘা যাওয়া যায় তিন ঘণ্টায়। কিংবা ফ্রেজারগঞ্জ হয়ে বকখালি, সেখান থেকে জেলে ডিঙি নিয়ে...। যদি আর একজন কারুকে সঙ্গী হিসেবে পাওয়া যেত!

রাজপথে অন্য সকলেই এখন নানা রকম কাজে ব্যস্ত হয়ে চলেছে, কোথায় যেন লোহার দামে সোনা নিলাম হয়ে যাচ্ছে, সেই দিকে ছুটছে সবাই।

শুধু আমারই কোনও উদ্দেশ্য নেই। ইলশেগুড়ি বৃষ্টির মধ্য দিয়ে আমি হাঁটছি, আমার যেন শরীর নেই, শুধু একটা আত্মা, আমাকে কেউ চিনতে পারছে না, একটা লোকও আমার সঙ্গে ডেকে কথা বলছে না।

কালীঘাট ব্রিজ পেরিয়ে আমি যেতে লাগলাম জেলখানার পাশ দিয়ে। এদিকে কেন, কোন কারণ নেই। জেলখানার উঁচু দেয়াল আগে ভাল করে লক্ষ্য করে দেখিনি। বেশ পুরু ব্যবস্থা। এই মুহূর্তে যদি কয়েকটা কয়েদি পাঁচিল ডিঙিয়ে পালাবার চেষ্টা করত, বেজে উঠত পাগলা ঘণ্টা, দুমদাম গুলির শব্দ, বেশ একটা সিনেমা-সিনেমা ব্যাপার, দারুণ হত তাহলে। আমি পলাতকদের বলতাম, চলো, চলো, আমি তোমাদের সমুদ্রের দিকে নিয়ে যাচ্ছি।

জেলখানার দেয়ালের ধার ঘেঁষে ঘেঁষেই আমি ঘুরে গেলাম বেকার রোডে। এই রাস্তা ধরে সোজা ময়দানে পড়া যায়। ময়দানে গিয়ে একটা গাছের নিচেও শুয়ে থাকা যায় কিছুক্ষণ, যতক্ষণ না খিদে পায় খুব।

ন্যাশানাল লাইব্রেরির ছোট গেটটার সামনে দিয়ে যেতে যেতে মনে হল, ঢুকব নাকি? অনেক দিন যাইনি। কিন্তু আমার কার্ড নেই। পরীক্ষা পাশেরও গরজ নেই, বিদ্বান হবারও শখ নেই, তাহলে যাব কেন? অবশ্য এই গেটটা দিয়ে ঢুকে চিড়িয়াখানার দিকের বড় গেট দিয়ে বেরিয়ে যাওয়া যায়, তাতে শর্ট কাট হবে।

ভেতরে ঢোকার পর মনে হল, আমার নিয়তিই যেন আমাকে এখানে টেনে এনেছে। আশ্চর্য ব্যাপার, স্বর্ণর সঙ্গে সম্প্রতি পরিচয় হবার আগে ওকে তো আমি কোথাও দেখিনি। ওর মতো মেয়েকে দেখলে নিশ্চয়ই মনে থাকত। অথচ এখন কফিহাউসে, রাস্তায় প্রায়ই স্বর্ণর সঙ্গে দেখা হয়ে যাচ্ছে। আজও কি আকস্মিক দেখা? স্বর্ণ যে ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে নিয়মিত আসে, সেটা কি আমি জানতাম? অবচেতনে কোথাও ছিল, সেই জন্যই আমি এ-দিকে এসেছি?

স্বর্ণর মাথায় একটা টুকটুকে লাল রঙের ছাতা, আর একটি লম্বা চেহারার যুবক তার পাশাপাশি হাঁটছে, তার মাথা কিন্তু ছাতার বাইরে। ওরা লাইব্রেরির সিঁড়ি দিকে না গিয়ে যাচ্ছে বড় গেটের দিকে।

স্বর্ণকে দেখে আমার বুকটা ধক্ করে উঠল কেন? ভয়ে? হায় নীললোহিত, তোমার এই অবস্থা, সুন্দরী মেয়েদের দেখেও তুমি ভয় পাচ্ছ! ভয় ছাড়া আর কী, প্রেম তো নয়। স্বর্ণ দেখা হলেই বকুনির সুরে কথা বলে। স্বর্ণর পাশে যে হাঁটছে, তার নাম জয়দীপ না জয়নন্দন কী যেন, একটা ওয়াটারপ্রুফ কোম্পানির মালিকের ছেলে, এটুকু আমি জানি। আমার কফি হাউসের বন্ধুরা স্বর্ণ সম্পর্কে অনেক খবর রাখে। প্রত্যেক বছরেই আড্ডাধারীরা একটি কোনও নিয়মিত তরুণীকে মিস কফি হাউস আখ্যা দেয় মনে মনে। এ বছর স্বর্ণ সেই মুকুট পেয়েছে।

আমি উলটো দিকে ফিরে আবার ছোট গেট দিয়েই বেরিয়ে গেলাম। স্বর্ণর চোখে পড়তে চাই না। ফট করে হয়তো জেরা করে বসবে, আমি ন্যাশনাল লাইব্রেরির কাছে ঘুর ঘুর করছি কেন? আমি রিসার্চ স্কলার নই, অমুক নই, তমুক নই। মূল রাস্তা দিয়ে ঘুরে এসে আমি চিড়িয়াখানার গেটের সামনে দাঁড়ালাম। সিগারেট কিনতে হবে। অবশ্য চিড়িয়াখানার ভেরতটায় একবার ঘুরে আসা যায়।

সিগারেট ধরিয়ে মুখ ফিরিয়েই দেখলাম, স্বর্ণ প্রায় ছুটতে ছুটতে আসছে, একা। ছাতাটা গুটিয়ে নিয়েছে, কাঁধে একটা বইয়ের ঝোলা। একটা থ্রি বি বাস দাঁড়িয়ে, স্বর্ণ সেটাই ধরতে চায়, কিন্তু এসে পৌঁছোবার আগেই বাসটা ছেড়ে গেল। এই বর্ষার দিনেও স্বর্ণর মুখটা রাগে গনগনে হয়ে আছে। দূরে, বড় গেটের মাঝখানে বিবেকানন্দর ভঙ্গিতে বুকের ওপর আড়াআড়ি হাত রেখে দাঁড়িয়ে আছে তার প্রেমিক।

আমি দেওয়ালের সঙ্গে একেবারে মিশে রইলাম। দেখাই যাক না নাটকটা কোন দিকে গড়ায়। স্বর্ণ এ-দিক ও-দিক মুখ ঘুরিয়ে ট্যাক্সি খুঁজছে।

জয়দীপ বা জয়নন্দন কিন্তু দূরেই দাঁড়িয়ে রইল। আচ্ছা বোকা ছেলে তোর মেয়েরা রেগে গেলে দূরে থাকতে নেই, কাছে এসে তাদের আরও রাগিয়ে দিতে হয়, তা-ও জানে না।

যাত্রী-বোঝাই একটা ট্যাক্সি এসে থামতেই স্বর্ণ ছুটে গেল সে-দিকে। যাত্রীরা সবাই নেবে যাবার পর স্বর্ণ উঠতে যেতেই, ড্রাইভার বলল, যাবে না, এ গাড়ি আর যাবে না! স্বর্ণ

দরজা খুলে তবু জোর করে উঠে পড়বার চেষ্টা করছে, ড্রাইভারের অ্যাসিস্ট্যান্ট হাত বাড়িয়ে বাধা দিচ্ছে তাকে। আজকাল ট্যাক্সিচালকদের একটুও শিভালরি নেই!

স্বর্ণ ট্যাক্সির দরজার হাতল শক্ত করে ধরে আছে, কিছুতেই ছাড়বেনা। এবারে ট্যাক্সিওয়ালা ওকে অপমান করবে। এই অবস্থা দেখেও নির্বিকারে দূরে দাঁড়িয়ে থাকা যায় না। তার প্রেমিক এখনও দাঁড়িয়ে দেখছে। ব্যাপারটা ঠিক যেন একটা ত্রিভুজের মতো। ট্যাক্সির কাছে স্বর্ণ, খানিকটা দূরে এক কোণে আমি, আর এক কোণে তার প্রেমিক। ওই ইডিয়টটা এখনও চুপ করে আছে কেন?

ট্যাক্সিচালক জোরে কর্কশ গলায় কিছু একটা কথা বলতেই আমি এগিয়ে গিয়ে বললাম, কী ব্যাপার, যেতে চাইছে না? ট্যাক্সিওয়ালাদের জব্দ করার সব চেয়ে ভাল উপায় হচ্ছে ট্যাক্সিতে না চড়া।

ড্রাইভার বলল, ওনাকে বলছি, গাড়ি খারাপ আছে, গ্যারেজে যেতে হবে!

আমি তাকে পোকা-মাকড়ের মতো অগ্রাহ্য করে স্বর্ণকে আবার বললাম, কাছেই একবালপুরের মোড়ে মিনিবাসের স্ট্যান্ড আছে, চলুন আমি আপনাকে সেই পর্যন্ত পৌঁছে দিচ্ছি।

স্বর্ণ গাড়ির হাতল ছেড়ে দিল। তারপর টানা টানা সুন্দর চোখ দুটিতে অগ্নিবর্ষণ করে সে জিজ্ঞেস করল, আপনি, এই সময়...এখানে কী করছেন?

জানতাম, এ মেয়ে প্রথমে এই কথাই বলবে। ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে ঢোকার যোগ্যতা আমার না থাকতে পারে, কিন্তু শখ করে আমি কি চিড়িয়াখানাতেও যেতে পারি না?

আমি বললাম, নতুন একটা সিংহ এসেছে চিড়িয়াখানায়, দেখতে যাবেন?

নাঃ! আপনি ট্যাক্সিটাকে ছেড়ে দিলেন কেন, আমি ঠিক উঠতাম।

পর পর দু'জনের সঙ্গে ঝগড়া করতে নেই!

স্বর্ণ এর উত্তরে কিছু বলবার আগেই আমি বড় গেটের দিকে হাতছানি দিয়ে ওর প্রেমিককে ডাকলাম। ওয়াটারপ্রুফ কোম্পানির মালিকের ছেলেটি তো খুব গোঁয়ার দেখছি, হন হন করে চলে যাচ্ছে লাইব্রেরির দিকে।

স্বর্ণ আমাকে ধমক দিয়ে বলল, ওকে ডাকছেন কেন? আপনি... আপনাকে কে এখানে মাথা গলাতে বলেছে। আপনি যেখানে যাচ্ছিলেন, সেখানে যান।

আমি তো কোথাও যাচ্ছি না!

এই যে বললেন, সিংহ দেখতে যাবেন।

একলা একলা কেউ সিংহ দেখতে যায়? আসলে কি জানেন, একটু আগে আমার খুব ইচ্ছে হচ্ছিল সমুদ্রের ধারে যাওয়ার, তার বদলে চিড়িয়াখানায় চলে এলাম।

স্বর্ণ সোজাসুজি আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বেশ কয়েক মুহূর্ত সময় নিল। তারপর নীরস গলায় বললো, দেখুন, আপনার এ-সব ন্যাকামির কথাবার্তা শুনতে আমার একটুও ভাল লাগছে না। প্লিজ, লিভ মি অ্যালোন! আমাকে বিরক্ত করার কোনও অধিকার নেই আপনার।

এ-রকম কথা শুনে আমার অপমানিত বোধ করা উচিত ছিল, কিন্তু বোঝাই তো যাচ্ছে, এসব স্বর্ণর অতিরিক্ত রাগের কথা! রাগ হলে এক-এক জনের আর কোনও জ্ঞান থাকে না, মুখের ভাষাও খুব খারাপ হয়ে যায়। স্বর্ণকে বিরক্ত করাও আমার অভিপ্রায় নয়, কিন্তু এক ক্রুদ্ধ সুন্দরী যুবতীকে কলকাতার ট্যাক্সিচালকদের হাতে সমর্পণ করাও তো যায় না!

আমি বললাম, ওই যে একটা মিনিবাস আসছে, খুব বেশি ভিড় নেই।

না, আমি ট্যাক্সিতেই যাব।

ঠিক আছে। আপনার ট্যাক্সিতে আমাকে একটু লিফট দেবেন?

স্বর্ণ রীতিমতো চেঁচিয়ে বলে উঠল, আই হেইট ইউ! আই হেইট ইউ অল! আপনারা সবাই সমান! আপনারা সবাই স্বার্থপর! শুধু নিজেদের জেদটাই আপনারা বজায় রাখতে চান।

অন্যের হয়ে গালাগালি খেতে আমার খারাপ লাগেনা, কিন্তু স্বর্ণর চোখ দুটি বড় বেশি উজ্জ্বল, বেশ অস্বাভাবিক দেখাচ্ছে। সমস্ত পুরুষ জাতির প্রতি ঘৃণা। এ লক্ষণ তো ভাল নয়। উইমেন্স লিব এর সমর্থক নিশ্চয়ই স্বর্ণ, তাহলেও এত ঘৃণা কীসের! যারা মেল শোভেনিস্ট তারা কিন্তু মেয়েদের প্রতি ভালবাসা জানাবার ব্যাপারে অকৃপণ।

এইসময় ঝুপঝুপ করে বৃষ্টি নেমে গেল। স্বর্ণ ছাতাটা খুলে ফেলল ফটাস করে। আমি চিড়িয়াখানার গেটের দিকে দৌড়ে যাব ভেবেছিলাম, পরক্ষণেই মত বদলে ফেলে স্বর্ণর কাছ ঘেঁষে চলে এলাম ছাতার তলায়। স্বর্ণ সঙ্গে সঙ্গে সরে গলে কয়েক পা। মুখ ফিরিয়ে বলল, ঘেন্না করি। আপনাদের সবাইকে আমি ঘেন্না করি।

ঝট করে আমার মনে হল, স্বর্ণর মাথাতেও পাগলামির লক্ষণ নেই তো? কয়েক দিন আগেও আমার সঙ্গে বেশ স্বাভাবিক ব্যবহার করেছে। কিংবা রাগে-দুঃখে স্বর্ণ এখনই পাগল হয়ে যাচ্ছে। এই সময় আমার কী করা উচিত? ওয়াটারপ্রুফের বাড়ির ছেলেটি কী বলেছে স্বর্ণকে? কাপুরুষ! একটা মেয়েকে রাগিয়ে দিয়ে তার পরে পালিয়ে যায়!

আর একটা ট্যাক্সি এসে থামতেই আমি প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়লাম তার সামনে। এই ড্রাইভার এক কথাতেই যেতে রাজি। আমি স্বর্ণর কাছে এসে খুব মিনতি ভরা গলায় বললাম, প্লিজ, আসুন, আমিও আপনাদের বাড়ির দিকে যাব।

উত্তর না দিয়ে স্বর্ণ চলে এল ট্যাক্সির কাছে। ছাতাটা না গুটিয়েই সে উঠতে যাচ্ছিল, আমি ওর হাত থেকে নিয়ে সেটা বন্ধ করে ফেললাম। তারপর মাঝখানে অনেকটা জায়গা ফাঁক রেখে দু'জানলার পাশে বসলাম দুজনে।

ট্যাক্সিটা চলতে শুরু করার পর পেছনের কাচ দিয়ে দেখলাম ওয়াটারপ্রুফের বাচ্চা আবার গেটের কাছে এসে দাঁড়িয়ে আমাদের দেখছে আর ভিজছে বৃষ্টিতে। ভিজুক!

খালটা পার হবার পর আমি খুব কোমল গলায় জিজ্ঞেস করলাম, কী হয়েছে, স্বর্ণ? হঠাৎ এত রেগে গেলেন?

কোনও উত্তর নেই।

আমি কি আপনার কাছে কোনও অন্যায় করেছি?

স্বর্ণ মুখ ফেরাল রাস্তার দিকে! আমি তবুও ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করলাম, আমি, আমি আপনার সঙ্গে ট্যাক্সিতে উঠেছি বলে কি আপনি খুবই অপছন্দ করছেন? আমি নেমে যেতে পারি এখানে।

এবার স্বর্ণ কান্নায় ভেঙে পড়ল। বাইরে প্রবল বৃষ্টি, কিন্তু স্বর্ণর কান্না একেবারে পাহাড়ি ঢলের মতো। দু'হাতে মুখ ঢেকে সে তার হৃদয়টাকে যেন সহস্র টুকরো করে ফেলছে। কেঁপে কেঁপে উঠছে তার শরীর। ট্যাক্সি ড্রাইভার অবাক ভাবে পেছন ফিরে দেখতে লাগল।

আমি অনেকটা নিশ্চিন্ত বোধ করলাম এবার। স্বর্ণর মতো তেজি মেয়ে যে এ-রকম অসহায় ভাবে কখনও কাঁদতে পারে, তা আমি কখনও ভাবিনি। স্বর্ণর গায়ে হাত দিয়ে তাকে সান্ত্বনা জানাবার সাহস আমার নেই। কারুর কান্না দেখে এ-রকম খুশি আমি হইনি আগে কোনও দিন। আমি একটা সিগারেট ধরালাম।

৭-৮. পুরুলিয়ার সেবা প্রতিষ্ঠান

পুরুলিয়ার সেবা প্রতিষ্ঠান থেকে চিঠির উত্তর এসেছে। সেই ডেনিশ ডাক্তারটির মৃত্যু হয়েছে এক মাস আগে। সেখানে পাগলের চিকিৎসা করার কোনও ব্যবস্থা নেই, সুতরাং আমাদের আর পুরুলিয়া যাওয়ার কোনও মানে হয় না। অবশ্য যাওয়ার কোনও প্রয়োজনও হবে না মনে হচ্ছে। ভোলানাথের উন্নতি ও পরিবর্তন সত্যিই বিস্ময়কর।

একটা সপ্তাহ কেটে গেছে, ভোলানাথ কোনও গণ্ডগোল করেনি। সারা দিন সে নিজের ঘরেই বসে থাকে, খাবার এলে চেটেপুটে খায়, নিজে নিজে স্নান করে, এমনকী নিজের জামা কাপড় পর্যন্ত কাচতে শুরু করেছে। চোখের দৃষ্টি পরিষ্কার। বেশ বড় বড় দাড়ি হয়েছে ভোলানাথের, এখন তাকে অনেকটা সাধু সাধু দেখায়। সে কথাবার্তাও বলে প্রায় সাধুদের মতো। কিংবা দার্শনিকদের মতে, যদিও এমন কিছু দার্শনিকতা নেই তার মধ্যে।

নিলয়দা তো ভোলানাথকে নিয়ে উচ্ছ্বসিত। যেন এটা তার নিজেরই বিশাল জয়। স্বর্ণ এক দিন আমাকে বলেছিল, উপকারেরও একটা নেশা আছে, নিলয়দা সেই নেশায় মেতে আছে। ভোলানাথ নামে পাগলটিকে বাঁচাবার চেষ্টার মধ্যে নিলয়দার একটা গোপন অহঙ্কারও রয়ে গেছে। স্বর্ণ অতি বুদ্ধিমতী মেয়ে, সে ধরেছে ঠিকই। এ-রকম হয়। তবে অহঙ্কার কিংবা নেশার জন্যও যদি কেউ অন্য মানুষের কিছু সাহায্য করে, সেটাও তো কম নয়।

আমি চিন্তিত অন্য কারণে। ভোলানাথকে কত দিন রাখা হবে ওই বোর্ডিং হাউসে? এর খরচ কে দেবে? নিলয়দা চাকরি ভালই করেন, কিন্তু সেরকম কিছু অবস্থাপন্ন নন। বাড়ির ট্যাক্সি নিয়ে কী একটা ঝামেলা হবার পর বকেয়া পঁয়তিরিশ হাজার টাকা ইনস্টলমেন্টে শোধ দিতে হচ্ছে। হোটেলে একটা উটকো মানুষ পুষতে গেলে মাসে অন্তত ছ'শো সাতশো টাকা লাগবেই। রূপাবউদি মাসের পর মাস এটা সহ্য করবেন কেন?

দ্বিতীয় কথা হল, ধরা যাক, ভোলানাথ একেবারে সুস্থ হয়ে গেল! তারপর কী হবে? এখনও সে তার নাম কিংবা পূর্ব পরিচয় মনে করতে পারছে না, কিংবা মনে পড়লেও বলছে না। পুরো সুস্থ হলে তা তো জানা যাবেই। হয়তো তার স্ত্রী আছে, ছেলে-মেয়ে আছে কোথাও, কত বছর আগে তাদের ফেলে চলে এসেছে কে জানে! আবার ভোলানাথ সেখানে ফিরে গিয়ে তাদের দায়িত্ব নেবে? নিতে পারবে? যদি ফিরে যেতে না চায়? অতীত একেবারে মুছে ফেলে সম্পূর্ণ নতুন জীবন শুরু করা সম্ভব? আমি এসব প্রশ্নের উত্তর জানি না।

রবিবার সকালে আমি যাইনি, নিলয়দা এগারোটা আন্দাজ আমার বাড়িতে এসে দারুণ উত্তেজনার সঙ্গে বললেন, জানিস, ভোলানাথ গান গাইতে পারে। চমৎকার গলা। আজ আমাকে দু'খানা গান শোনালো, নিখুঁত একেবারে, একটাও কথা ভুল করেনি!

আমিও এর মধ্যে ভোলানাথকে দু'একদিন গুন গুন করতে শুনেছি। শ্যামাসঙ্গীত ধরনের গান। সে-রকম একটা কিছু উঁচুদরের গলা বলে মনে হয়নি।

নিলয়দা বললেন, ও এক জন শিল্পী।

আমি নিলয়দাকে নিরুদ্যম করতে চাইলাম না। কৃত্রিম উৎসাহ দেখিয়ে বললাম, সত্যি ভাল গান গায়। ইস, একটা প্রতিভা নষ্ট হয়ে যাচ্ছিল।

তুই ভেবে দেখ নীলু, এক জন গায়ক, তার একটু মাথার গোলমাল আছে বলে রাস্তার লোকেরা তাকে মেরে ফেলবে? বড় বড় ডাক্তার দেখালাম, সবাই বললেন, ও চিকিৎসার অতীত। অথচ আমি নিজের চেষ্টায়, তুইও সাহায্য করেছিস অনেক, ওকে ভাল করে তুললাম তো।

নিলয়দা, সত্যি, তুমি যা করেছ, তার তুলনা নেই।

নিলয়দার মুখে লজ্জা লজ্জা হাসি ফুটে উঠল। বললেন, আমার যেটুকু সাধ্য... এ-রকম তো সকলেরই করা উচিত... তোর সাহায্য না পেলে আমি আরও অনেক অসুবিধেয় পড়তাম। তুই আজ বিকেলে আয়, ভোলানাথের গান শোনাব। হরিবাবু শুনেছে। হরিবাবু কি বলল জানিস? বলল, আপনারা একে পাগল বলেছিলেন কেন মশাই? এর তো সব ঠিকঠাক আছে, এর চেয়ে ঢের বেশি পাগলকে আমি অফিস-টফিসে চাকরি করতে দেখেছি। এবার ওকে একটা কাজে লাগিয়ে দিন। হরিবাবুর কথাটা আমার মনে লেগেছে। ভোলানাথকে শুধু সুস্থ করে তুললেই আমাদের দায়িত্ব শেষ হবে না, ওকে আবার জীবনে প্রতিষ্ঠিত করিয়ে দিতে হবে। ওর জন্য কাজ জোগাড় করতে হবে।

ভোলানাথ কী কাজ করবে?

আমি কি ভাবছি জানিস, ভোলানাথকে দিয়ে একটা গানের ফাংশান করব। রেডিও, টিভি, খবরে কাগজের লোকদের ডেকে শোনাব। তুই আজ বিকেলে আয়, তখন বসে প্ল্যান করা যাবে।

নিলয়দা, আজ বিকেলে আমি যেতে পারছি না।

তুই আজ আসবি না?

না, আমার একটা কাজ আছে।

কী কাজ?

যেতে হবে এক জায়গায়।

নিলয়দাকে এগিয়ে দিতে এলাম বড় রাস্তা পর্যন্ত। শেষের দিকটায় বেশ অস্বস্তিতে পড়ে গিয়েছিলাম। আজ বিকেলবেলা স্বর্ণর সঙ্গে আমার অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে, কিন্তু সে কথা নিলয়দাকে জানানো উচিত কি না বুঝতে পারলাম না। স্বর্ণ আমার সঙ্গে একলা দেখা

করতে চেয়েছে এক জায়গায়, নিলয়দা সেকথা শুনলে ভাবতেন কি যে আমি তার শ্যালিকার সঙ্গে লুকিয়ে প্রেম করছি? কিন্তু ব্যাপারটা সেরকম কিছুই নয়।

কান্নায় দূরত্ব মুছে যায়। মেয়েরা যার সামনে একবার বুক ভাসিয়ে কাঁদে, তাকে আর সহজে ছাড়তে চায় না। জয়নন্দনের সঙ্গে কী নিয়ে ঝগড়া হয়েছে, সে কথা স্বর্ণ আমাকে এখনও বলেনি, কিন্তু সেই ছেলেটি সাংঘাতিক কোনও কঠিন কথা নিশ্চয়ই বলেছে ওকে। সেই দিন থেকে স্বর্ণর জীবনটাই নাকি পালটে গেছে। আমি সেদিন ওইভাবে সাহায্য না করলে ও নাকি পাগলই হয়ে যেত! এখন স্বর্ণ আমাকে ওর কাছাকাছি পেতে চায়, আমাকে অনেক কথা বলতে চায়।

কিন্তু এটা প্রেম নয়। আমার কাছে এসে স্বর্ণ তো সবসময় জয়নন্দনের কথাই বলে। জয়নন্দনকে কেন ওর পছন্দ হয়েছিল, জননন্দন যে এতটা খারাপ মানুষ, ও বুঝতে পারেনি ইত্যাদি। আমি স্পষ্ট বুঝতে পারি, স্বর্ণর মন এখনও জয়নন্দনের কাছেই বাঁধা দেওয়া আছে, তার কাছেই ফিরে যাবে। মাঝখানে কিছুদিন মান-অভিমানের পালা চলছে। এ-রকমভাবে অপরের প্রেমের প্রক্সি দিতে আমার একটুও ভাল লাগে না। এক দিন আমে-দুধে আবার মিশে যাবে, আমি আঁটির মতো বাইরে পড়ে থাকব।

অথচ একটি যুবতী কন্যা নিরালায় দেখা করতে চাইলে তা প্রত্যাখ্যানই-বা করা যায় কীভাবে? আমি তো আর বলতে পারি না, আমি কাজে ব্যস্ত। আমার ব্যস্ততার কথা শুনলেই সবাই হাসে।

সাড়ে পাঁচটার সময় রেডিও স্টেশনের সামনে দেখা করবার কথা, আমারই পাঁচ মিনিট দেরি হয়ে গেল। নির্ধারিত জায়গায় পুরুষদেরই আগে পৌঁছনো উচিত, মেয়েদের দাঁড় করিয়ে রাখা অন্যায়। কিন্তু স্বর্ণ রাগ করল না। আমি কাচুমাচু হয়ে ক্ষমা চাইতেই ও হেসে ফেলে বলল, আমারই তো দোষ, আমার উচিত ছিল দশ মিনিট দেরি করে আসা। তুমি সাঁতার জানো?

প্রশ্নটা একটু অপ্রত্যাশিত। আমি বিস্ময় গোপন করে বললাম, হ্যাঁ, জানি। অনেক দিন অভ্যেস নেই অবশ্য। কেন বলো তো?

সাঁতার জানো, তাহলে তুমি নিশ্চয়ই নৌকোয় উঠতে ভয় পাবেনা! জয় খুব জলকে ভয় পায়। ওর জন্য আমার কোনও দিন নৌকোয় বেড়ানো হয়নি।

সাঁতার শিখতে আর কদিন লাগে? শিখে নিলেই পারে।

ও সাঁতার শিখুক না-শিখুক, তাতে এখন আর কিছু যায় আসে না। আমি জয়ের চেহারাটাও ভুলে গেছি। তুমি যদি সে-দিন ট্যাক্সিতে না উঠতে, তাহলে আমি কোনও দিন পুরুষ জাতটাকেই ক্ষমা করতে পারতাম না! আজ যে শাড়িটা পরেছি, আমাকে মানিয়েছে?

তোমাকে অপূর্ব দেখাচ্ছে। যে-কোনও রঙই তোমাকে মানায়, তবু এই আকাশি নীল রঙটা যেন আরও সুন্দর।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, তারপর তুমি বললে, জয়ের একটা গুণ আছে, ও রঙটা খুব ভাল বোঝে। এটা আকাশি নীল নয়, এটা টারকয়েজ ব্লু!

হ্যাঁ, আমি রঙটা ভাল বুঝি না। নৌকোয় বেড়াবে, চলো তাহলে আউট্রাম ঘাটের দিকে যাই।

নীল রঙ কত রকম হয় জানো?

স্বর্ণ, আমি শুধু জানি মানুষের দুঃখের রঙ নীল।

তুমি দুঃখের কী জানো? তোমার তো সব সময় ইয়ার্কি ইয়ার্কি ভাব।

হাঃ হাঃ হাঃ।

হাসছ কেন, এটা কি হাসির কথা? জয়েরও এই এক দোষ, যখন তখন, কোনও মানে নেই, তবু হেসে ওঠে। এক দিন হয়েছে কী –

চলো, স্বর্ণ, রাস্তাটা পার হয়ে যাই।

আমার হাত ধরতে হবে না। আমি কি কচি মেয়ে নাকি?

শুধু কচি মেয়েদেরই বুঝি হাত ধরতে হয়?

তুমি কি জয়কে চেনো? তোমার সঙ্গে আলাপ আছে?

ও-রকম খারাপ ছেলেদের সঙ্গে আমি আলাপ করি না। যারা মেয়েদের মনে আঘাত দেয়, বৃষ্টির মধ্যে বান্ধবীর সঙ্গে সামান্য ঝগড়া করে যারা একা ছেড়ে দেয় ।

স্বর্ণ আমার দিকে গাঢ়ভাবে তাকিয়ে বিষণ্ণ ভাবে বলল, নীলকমল, তুমি আমার সামনে আর জয়ের নাম উচ্চারণও করবে না। আমি ওকে আমার জীবন থেকে মুছে ফেলেছি।

আমার নাম নীলকমল নয়। অনেকে আমাকে নীলু বলে ডাকে।

আমি তোমাকে নীলকমল বলেই ডাকব। নীলু কী একটা বাজে নাম! ছেলেদের ছোট নাম আমার পছন্দ নয়।

তুমি তো জয়নন্দনকে ছোট করে জয় বলে ডাকো।

বললাম না, ওই নাম তুমি আমার সামনে কখনও উচ্চারণ করবে না।

স্বর্ণ, ফুচকা খাবে?

ফুচকা? তুমি আমাকে রাস্তায় দাঁড়িয়ে এই সব খেতে বলছ?

হ্যাঁ, তাতে কী হয়েছে? ফুচকা, আলু চটপটি এগুলো চমৎকার জিনিস। গঙ্গার ধারে... এখানে তোমাকে কে দেখতে পাবে?

জয়ের বাবা রোজ এখানে ইভনিং ওয়াক করতে আসে। হ্যাঁ, ফুচকা খাব। দেখুকনা, জয়ের বাবা দেখলে আমার বয়ে গেল! ওদের সঙ্গে আমার কোনও সম্পর্ক নেই।

তবু ফুচকা খেতে খেতে স্বর্ণ বার বার এ-দিক ও-দিক চেয়ে দেখতে লাগল, যেন কারুকে খুঁজছে। ও ফুচকা খেতেই জানে না। তেঁতুলজলটা ফেলে দিচ্ছে আগে, অথচ ওটাই তো আসল।

নৌকো খুঁজতে খুঁজতে আমরা গঙ্গার ধার ধরে হেঁটে এলাম অনেকটা। স্বর্ণ অনবরত জয়ের কথা বলে যেতে লাগল। জয়ের সঙ্গেও এ-দিকটায় প্রায়ই বেড়াতে আসত, তা বোঝা গেল। দোতলা রেস্তোরাঁটার দিকে আঙুল তুলে বলল, ওই যে কোণের দিকে জানলার ধারের টেবিলটা, ওটা ছিল আমাদের জন্য বাঁধা, আমরা প্রত্যেক শনিবার ওখানে এসে বসতাম। জয় তো নৌকোয় চড়ে না, ওখানে বসে বসেই আমরা নৌকো দেখতাম। আগের মাসে সেই যে একদিন দারুণ ঝড় উঠেছিল।

জয় কোনও জায়গা থেকে লুকিয়ে এখন আমাদের লক্ষ্য করছে না তো? তোমার সঙ্গে আমাকে দেখলে জয় নিশ্চয়ই খুব রেগে যাবে। সুতরাং, আমি বলছিলাম কী –।

নীলকমল, তোমাকে বলেছি না, তুমি আমার সামনে জয়ের নাম উচ্চারণ করবে না? চলো। নৌকোয় চাপব!

আমি আবার অকারণে হাঃ হাঃ করে হেসে উঠলাম। নিলয়দা যদি কোনও দিন জিজ্ঞেস করে যে তুই কেন আমার শ্যালিকাকে নিয়ে গঙ্গার ধারে বেড়াতে গিয়েছিলি? তাহলে আমি বলব, তোমার শ্যালিকা পাগল হয়ে যাচ্ছিল, আমি তার চিকিৎসা করছিলাম।

বাড়ি ফিরতে বেশ রাত হল। ফিরেই মায়ের কাছে শুনলাম, নিলয়দা এর মধ্যে দু'বার এসে আমার খোঁজ করে গেছে। খুব জরুরি দরকার, আজ রাত্তিরেই ফোন করতে বলেছে।

আমি মাকে জিজ্ঞেস করলাম, কী দরকার কিছু বলেনি?

মা বলল, না, কিছু বলল না, বসতেও চাইল না। খুব রেগে আছে মনে হল।

নিলয়দা এর মধ্যেই জেনে গেছে স্বর্ণর ব্যাপরাটা? গঙ্গায় আমাদের দু'জনকে কেউ নৌকোয় বেড়াতে দেখে সোজা নিলয়দার কাছে গিয়ে রিপোর্ট করেছে? কিন্তু স্বর্ণর সঙ্গে যদি আমার সত্যিই একটু ভাব-ভালবাসা হত, তাতেই-বা নিলয়দা আপত্তি করবে কেন? আমি কি এতটাই অযোগ্য?

এত রাতে পাশের ফ্ল্যাট থেকে ফোন করা যায় না। সামনের মোড়ে একটা ওষুধের দোকান অনেকক্ষণ খোলা থাকে, সেখান থেকে ফোন করা যেতে পারে। জামাটা গলিয়ে আবার বেবিয়ে পড়লাম।

ওষুধের দোকান পর্যন্ত যেতে হল না, তার আগেই দেখলাম নিলয়দা হন হন করে হেঁটে আসছে। উদভ্রান্তের মতো চেহারা।

কাছে এসে আমার হাত চেপে ধরে ব্যাকুল ভাবে জিজ্ঞেস করল কোথায় ছিলি নীলু। তোকে আমি সারা কলকাতা খুঁজছি, কফি হাউসেও গিয়েছিলাম।

প্রশ্নটা এড়িয়ে গিয়ে আমি জিজ্ঞেস করলাম, কী হয়েছে নিলয়দা?

সাঙ্ঘাতিক কাণ্ড হয়ে গেছে রে! সব নষ্ট হয়ে গেল! এত দিনের পরিশ্রম, এত চেষ্টা, ছি ছি ছি!

ভোলানাথের কিছু হয়েছে?

কী সুন্দর প্রোগ্রেস করছিল, আর কয়েকটা দিন, লোকে যদি একটু সাহায্য করত– ।

কী হয়েছে, বলো না!

ও বেঁচে আছে না মরে গেছে, তাই জানি না।

অ্যাঁ? সেকী। মরে গেছে মানে? বোর্ডিংহাউস ছেড়ে চলে গেছে? পালিয়ে গেছে?

ওকে থানায় ধরে নিয়ে রেখেছে।

থানায়... আবার কারুকে মেরেছে?

সকালে তোকে বললাম তো, কী সুন্দর গান শোনাল? আমার সঙ্গে অনেক কথা বলল, চমৎকার ব্যবহার, কিছুই বোঝা যায়নি।

বিকেলে ওখানে গিয়ে দেখি হই হই কাণ্ড। আমি পৌঁছবার একটু আগেই ঘটনাটা ঘটে গেছে। ইস, একটু আগে যদি যেতাম।

নিলয়দা একটা বাড়ির দেয়ালে হেলান দিয়ে মাথায় হাত দিল। যেন নিলয়দার একেবারে সর্বনাশ হয়ে গেছে। গুরুতর শোকগ্রস্ত মানুষ আমি বিশেষ দেখিনি, তবে এর চেয়ে বেশি আর কী হতে পারে। নিলয়দা একেবারে বিধ্বস্ত! এটা শোক, না পরাজয়?

আমি আস্তে আস্তে জিজ্ঞেস করলাম, কাকে কামড়াল, এবার কোনো পুরুষকেই?

মাথা থেকে হাত নামিয়ে নিলয়দা বললেন, ওরা তো বলছে, তিন জনকে। এক তলার হোটেলে এক জন ঝি ছিল, সে ছাদে উঠেছিল কাপড় শুকোতে দিতে প্রথমে... ভোলানাথ তাকে কামড়ে দেয়, সেই ঝি কোনওক্রমে ছাড়িয়ে নিয়ে পালিয়ে যাচ্ছিল, ভোলানাথ তাকে তাড়া করে যায়, তারপর রাস্তার আর দুটি মেয়েকে কামড়ে দিয়েছে। তার মধ্যে একটা মেয়ের বয়েস তেরো-চোদ্দ বছর, তবে কারুরই বেশি কিছু ক্ষতি হয়নি শুনলাম। রাস্তার লোকেরা তখন ভোলানাথকে মারতে মারতে মাটিতে শুইয়ে ফেলে! একেবারে মেরেই ফেলত, হরিবাবু দৌড়ে গিয়ে একটা পুলিশ ডেকে আনে। সেই পুলিশ তখন ওকে

টানতে টানতে থানায় নিয়ে যায়। হবিবাবু বলল, ভোলানাথ যা মার খেয়েছে, তাতে ওর পক্ষে এখন বেঁচে থাকাটাই আশ্চর্য।

কোন থানায় নিয়ে গেছে?

ভবানীপুর থানায়। সেখানে আমি গিয়েছিলাম। কিছুতেই জামিনে ছাড়তে রাজি হলনা। ভোলানাথের সঙ্গে আমাকে একবার দেখা করতেও দিল না। সেই জন্যই তো সন্দেহ হচ্ছে... অবশ্য বলল যে কাল কোর্টে কেস উঠবে, সেই সময় দেখা করতে!

ভোলানাথের জন্য আমার একটু একটু কষ্ট হল, কিন্তু তার চেয়েও অনেক বেশি কষ্ট হল নিলয়দার জন্য। নিলয়দার মুখে একটু আলো নেই, চোখ দুটো ঘষা কাচ।

ভাঙা ভাঙা গলায় নিলয়দা বলল, এত চেষ্টা করলাম, কিছুই হল না। সবনষ্ট হয়ে গেল! সব ব্যর্থ হল!

.

০৮.

নখী, শৃঙ্গী, পুলিশ ও উকিলদের থেকে শত হস্ত দূরে থাকার উপদেশ দিয়েছেন শাস্ত্রকারগণ। এত দিন আমি শুধু গল্প-উপন্যাসেই কোর্টের বর্ণনা পড়েছি। এবারে সেখানে যেতে হল নিলয়দার সঙ্গে।

আমি আর নিলয়দা সাড়ে দশটার মধ্যেই ব্যাঙ্কশাল কোর্টে হাজির, কিন্তু খোঁজ নিয়ে জানা গেল আমাদের কেস উঠবে দুটোর পর। গেট দিয়ে ঢোকার মুখেই কয়েক জন দালাল আমাদের ছেঁকে ধরেছিল সস্তায় ভাল উকিল ঠিক করে দেবে বলে, কিন্তু আমরা কোনও উকিল নিইনি। দো-তলা তিন তলায় গম্ভীর মুখে ঘুরে বেড়াতে লাগলাম দুজনে। কোনও কোনও ঘরে কেস চলছে। কোনও কোনও ঘর খালি। ঘরগুলো বেশি বড় নয়। হিন্দিসিনেমার আদালত-দৃশ্যে যেসব বিরাট বিরাট ঘর দেখানো হয়, সেগুলো বোধহয়

হাইকোর্টের। এখানে যে-সব লোকজনদের দেখছি, প্রত্যেকেরই কী-রকম দাগি দাগি চেহারা। কে জানে, অন্যরাও আমাদের দেখে সেই রকম ভাবছে কিনা।

আমরা একটাও বাক্য বিনিময় করছি না। আসলে সকালবেলাতেই নিলয়দার সঙ্গে আমার একটু মন কষাকষি হয়ে গেছে। আমার দোষের মধ্যে এই যে, আমি বলেছিলাম, নিলয়দা, কোর্ট-ফোর্টে যাবার দরকার কী? ভোলানাথকে পুলিশে ধরে নিয়ে গেছে, এখন ওকে নিয়ে কী করা উচিত তা পুলিশই বুঝবে, আমাদের তো আর কোনও দায়িত্ব নেই।

নিলয়দা আমার দিকে এমন ভাবে তাকিয়েছিল, যেন আমি একটা জঘন্য পাপী! এ-রকম খারাপ কথা সে জীবনে শোনেনি। দারুণ আহত ভাবে বলেছিল, আমরা কোর্টে যাব না? তুই.. তুই কী বলছিল নীলু? আসামির কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে ভোলানাথ এ-দিক ওদিক তাকিয়ে খুঁজবে.. তার কোনও আত্মীয়-স্বজন, চেনা কারুকে দেখতে পাবে না, তখন তার মনের অবস্থা কীরকম হবে বল তো?

ভোলানাথের মনের অবস্থা নিয়ে চর্চা করার সাধ্য আমার আর নেই। মেয়েদের দেখলেই একটা লোক কামড়াতে যাবে, এ কী ধরনের পাগলামি! ওর জন্য কি পৃথিবীটা নারী-বর্জিত করে দিতে হবে?

কিন্তু নিলয়দা, আমরা তো ওকে পুলিশের হাতেই তুলে দিতে চেয়েছিলাম?

সে তো অন্য কথা! পুলিশকে সব বুঝিয়ে বলতাম, তারপর পুলিশ যদি ওকে কোনও হাসপাতালে রাখার ব্যবস্থা করত, আমরা মাঝে মাঝে ওকে দেখতে যেতাম... কিন্তু এখন পুলিশ ওকে ক্রিমিনাল চার্জে অ্যারেস্ট করেছে, থানায় জেরা করার নামে আরও কত অত্যাচার করেছে কে জানে... জজের কাছে মিথ্যে চার্জ দিয়ে দেবে, আমরা যদি কেস ডিফেন্ড না করি, জজ যদি ওর ফাঁসির হুকুম দিয়ে দেন?

ফাঁসি? আজকাল কারুর ফাঁসি হয় নাকি? ফাঁসি তো উঠে গেছে।

ফাঁসি উঠে গেছে? কে বলল তোকে?

রিসেন্টলি কোনও ফাঁসির ঘটনা তুমি শুনেছ? কিংবা কাগজে পড়েছ?

হ্যাঁ, ইয়ে, অনেক তো হয়... এই তো ভুট্টোর ফাঁসি হল!

সে তো পাকিস্তানে! ইন্ডিয়াতে আর ফাঁসি হয় না!

হ্যাঁ, হয়! কাগজে পড়েছি.. মনে পড়েছে, বিল্লা-রঙ্গা? ওদের কী হল?

ওদের ফাঁসি হয়েছে? কী জানি! কিন্তু ভোলানাথ তো খুন-টুন করেনি, মাত্র তিনটে মেয়েকে কামড়ে দিয়েছে!

যে তিন জন মেয়েকে কামড়েছে, মনে কর, তাদের কারুর সেপটিক হয়ে গেল, তারপর তাতেই মরে গেল, সেটাও তো খুন!

বউদিকে আর স্বর্ণকেও তো কামড়ে দিয়েছিল, ওদের তো সেপটিক হয়নি!

কী বাজে কথা বলছিস, নীলু? ওদের হয়নি বলে অন্য কারুর হতে পারে না? ওদের আস্তে কামড়েছিল।

যাই বলল নিলয়দা, ফাঁসিটা বড্ড বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে। ওর যাবজ্জীবন জেল হতে পারে, সেইটাই সব চেয়ে ভাল হবে। জেলের মধ্যে হাসপাতাল থাকে, আমি অনেক বইতে পড়েছি, সেখানে ভোলানাথের চিকিৎসা হবে।

তার আগে ওকে পাগল বলে প্রমাণ করতে হবে না? আমরা যদি ওকে ডিফেন্ড না করি, কে ওকে পাগল বলে বুঝবে? চোর-ডাকাত-খুনেদের সঙ্গে যদি ওকে রেখে দেয়, তারা ওকে জ্বালাতন করে মারবে। মানুষ হিসেবে ভোলানাথ যে অনেক উচ্চস্তরের।

কিন্তু নিলয়দা, জেলখানাই একমাত্র জায়গা, যেখানে কোনও মেয়ে থাকে না। একমাত্র জেলখানাতেই ভোলানাথ সুস্থ থাকবে!

জেলেও ফিমেল ওয়ার্ড থাকে। মেয়েরা বুঝি ক্রিমিনাল হয় না?

ফিমেল ওয়ার্ড নিশ্চয় আলাদা জায়গায়। জেলের মধ্যে কখনও ফ্রিমিক্সিং থাকতে পারে? তাহলে তো অনেকেই জেলে যেতে চাইত?

আমি তোর সঙ্গে তর্ক করতে চাই না, নীলু? তুই যেতে না চাস, ওয়েল অ্যান্ড গুড, আমাকে যেতেই হবে! আমি এত কষ্ট করলাম ওর জন্য, এখন ওকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেব। আমি ওর কেস ডিফেন্ড করব।

তুমি ওকে ছাড়িয়ে আনতে চাও? ছাড়িয়ে এনে এবারে কোথায় রাখবে?

না, ছাড়িয়ে আনতে চাই না। জজ সাহেবকে বোঝাব যে ও ঠিক কীরকম মানুষ। ওকে জেলেই রাখা হোক, কিন্তু ওর সঙ্গে যেন ভাল ব্যবহার করা হয়, ওকে গান গাইবার সুযোগ দেওয়া হয়।

কিন্তু ডিফেন্ড করা মানে কী? তার মানে তো ওর বিরুদ্ধে যা অভিযোগ তা খারিজ করা। ওকে নির্দোষ প্রমাণ করা।

ও তো নির্দোষই বলতে গেলে! সজ্ঞানে, বুঝে শুনে তো ও মেয়েদের কামড়াতে যায় না!

নির্দেষ প্রমাণ করলে জজ ওকে ছেড়ে দিতে বাধ্য হবেন!

না না, ওকে এক্ষুনি ছেড়ে দেওয়া হোক, তা আমরা চাই না। কোর্টে গিয়ে এক জন উকিল ঠিক করব।

উকিলকে বলব যে, আমরা মশাই আমাদের কেসে জিততে চাই না। আমাদের মক্কেল জেলেই থাকুক, সেটাই আমরা চাই। তবে কিনা, জেলের মধ্যে কে যেন বেশ আদর-যত্ন করা হয়।

এ কথা শুনলে উকিলবাবু আমাদেরই পাগল ভাববেন না?

আহা-হা, ব্যাপারটা সে-রকম নয়।

নিলয়দা, আমার মতে, আমাদের এখন ক্লিন চেপে যাওয়াই ভাল। তুমি ভোলানাথের জন্য অনেক চেষ্টা করেছ, দেখলে তো, তাতে কোনও লাভ হলো না। কোর্টে গেলেই তুমি আবার ওই ব্যাপারে জড়িয়ে পড়বে। তার চেয়ে বরং রূপাবউদি আর পাপুনকে নিয়ে পুরী কিংবা দার্জিলিং বেড়িয়ে এস কয়েক দিন।

নিলু, আমি কোনও দায়িত্ব নিলে মাঝখানে ছেড়ে দিয়ে পালিয়ে যাই না। ভোলানাথ এক জন মানুষ, কোনও জন্তু-জানোয়ার তো নয় যে যখন তখন ত্যাগ করা যায়! তুই আমি চেষ্টা করেও ওকে পুরোপুরি সাহয্য করতে পারিনি। এক-আধ জনের চেষ্টায় কিছু হয় না, রাষ্ট্রের উচিত ওর দায়িত্ব নেওয়া। অমাদের ওয়েলফেয়ার স্টেট না? সেই কথাই অমি আদালতকে বোঝাব!

নিলয়দা, তুমি যা বলছ, তা নিয়ে খবরের কাগজে প্রবন্ধ লেখো। কোর্টে যাবার দরকার কী?

তোকে যেতে হবে না, নীলু। আমি একলাই যাব!

সুতরাং আমাকে আসতেই হয়েছে। নিলয়দা অবশ্য এখনও আমার সঙ্গে ভাল করে কথাই বলছে না, মুখখানা উদাসীন করে আছে। ভোলানাথ জেল খাটবে, এই ব্যাপারটা কিছুতেই মন থেকে মেনে নিতে পারছে না নিলয়দা।

দুটো পর্যন্ত সময় কাটাতে হবে, তাই আমরা একটা কোর্ট রুমে ঢুকে বসে পড়লাম। খাঁচার মতো একটা জায়গায় তিন জন মহিলা আর দু'জন লোককে ভরে রাখা হয়েছে, এক জন উকিল দাঁড়িয়ে একটানা কী সব বলে যাচ্ছে। মামলাটা যে কীসের তা আমরা বেশ কিছুক্ষণ বুঝতেই পারলাম না। কাগজের আইন-আদালতের বিবরণ পড়ে আমার ধারণা ছিল, কোর্ট রুম বুঝি সব সময় সরগরম থাকে! কিন্তু এখানে তো কোনও রকম কথা কাটাকাটি, উত্তেজনা কিছুই নেই। জজের মাথায় পরচুল নেই। পাকানো গোঁফ নেই, নিছকই সাধারণ চেহারার এক জন মাঝবয়সী ভদ্রলোক! খানিক বাদে বুঝতে পারলাম, এটা একটা গৃহবধু হত্যার মামলা। রূপালি রায় নামে একজন শৌখিন অভিনেত্রীর আগুনে পুড়ে মৃত্যুর খবর কয়েক দিন আগেই পড়েছি। কিন্তু রোমাঞ্চকর কোনও তথ্যই জানা গেল না, উকিলবাবুটি শুধু একঘেয়ে ভাবে রূপালি রায়ের স্বামীর অ্যাকাউন্টের বিভিন্ন দিনের হিসেব পড়ে শোনাতে লাগলেন।

এক জন মহিলাকে দেখে বেশ চমকে উঠলাম। আমি জানতাম যে মেয়ে-উকিল শুধু হিন্দি সিনেমাতেই দেখা যায়, ওঁদের কোনও বাস্তব অস্তিত্ব নেই। কিন্তু এখানে সামনের সারিতে কালো গাউন পরে এক জন মহিলা বসে আছেন, তিনি দাঁড়ানো উকিলটির হাতে মাঝে মাঝে দু'একটা কাগজপত্র তুলে দিচ্ছেন। ভদ্রমহিলা খুবই সুন্দরী। অনেক সিনেমার নায়িকাই ওঁর কাছে হার মেনে যাবে।

আমি নিলয়দাকে ফিস ফিস করে বললাম, ওই মেয়ে-উকিলটিকে দেখেছ? দারুণ না?

রমণীর রূপ চর্চা করার মতো মনের অবস্থা নয় এখন নিলয়দার। আমার দিকে একটা রূঢ় দৃষ্টি দিয়ে বলল, চল, এখানে আর ভাল লাগছে না।

আর একটু বস না, যদি ওই মহিলা উঠে কিছু বলেন, সেটা শুনে যাই।

তুই বোস তাহলে! আমি বাইরে আছি।

অগত্যা আমাকেও উঠতে হল। বেরিয়ে এসে করিডর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে বললাম, নিলয়দা, আমি যদি কখনও পুলিশের হাতে ধরা পড়ি, তুমি আমার জন্য ওই ভদ্রমহিলা-উকিলকে ঠিক কোরো।

নীলু, তোর এ-সব ইয়ার্কি এখন আমার ভাল লাগছে না।

নিলয়দা, তুমি দিন দিন বড় শুকনো সমাজসেবী হয়ে যাচ্ছ। শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন রসে-বশে থাকতে! সুন্দরী মহিলা দেখলেই আমার শ্রীরামকৃষ্ণের এই কথাটা মনে পড়ে যায়।

আরও দু'তিনটি আদলত কক্ষে আমরা উঁকি দিয়ে দেখলাম। কোথাও মজার ব্যাপার কিছু নেই। মাত্র সাড়ে এগারোটা বাজে, দুটো বাজতে অনেক দেরি, সময় যেন আর কাটছেই না।

ব্যাঙ্কশাল কোর্ট থেকে বেরিয়ে আমরা লালদিঘিতে বসে রইলাম কিছুক্ষণ। তারপর একটা দোকানে ঢুকে মোগলাই পরোটা আর মাংসর লাঞ্চ খেলাম। তারপর পৌনে দুটো বাজতে না বাজতেই চলে এলুম ন'নম্বর কোর্ট রুমে।

খাঁচার মধ্যে ছ'সাত জন আসামিকে ভরে রাখা হয়েছে। তাদের মধ্যে দেখতে পেলাম ভোলানাথকে। গায়ের জামাটি ছিন্নভিন্ন, মুখে ময়লা মাখা, কপালে ব্যান্ডেজ। একেবারে চেনাই যায় না!

ভোলানাথ নিলয়দাকে দেখেই চেঁচিয়ে উঠল, বাবা! বাবা!

পাশে দাঁড়ানো এক জন সেপাই বলল, চোপ! কথা বলার কানুন নেই!

ভোলানাথ লোহার গরাদের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে তবু বলল, বাবা! ও বাবা!

সেপাইটি একটা রুল দিয়ে গরাদের ওপর মেরে বলল, চোপ! চোপ!

এক জন আসামি ভোলানাথের হাত ধরে টেনে ঠেলে দিল ভেতরের দিকে।

নিলয়দা বিমূঢ় ভাবে তাকাল আমার দিকে। ভোলানাথের এ কী নতুন পরিবর্তন, হঠাৎ বাবা বলে ডাকছে! আগে তার মুখে কোনও রকম ডাকই শোনা যায়নি। নিলয়দা কিংবা আমার নাম সে মনে রাখতে পারে না।

হাকিম এখনও আসেননি। পাশের ছোট টেবিলে পেশকার বসে আছেন, তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে কাগজপত্র বুঝিয়ে দিচ্ছেন কোর্ট-ইনসপেকটর। ছ'সাত জন উকিল বসে আছেন সামনের দিকে, আমরা দুজন ছাড়া বাইরের লোক আর কেউ নেই।

এক জন উকিলবাবু পেছন ফিরে জিজ্ঞেস করলেন, আমাদের ল-ইয়ার কে? কী কেস?

নিলয়দা উত্তর দেবার আগেই আমি বললাম, আমাদের কোনও ল-ইয়ার নেই। আমরা এমনি দেখতে এসেছি।

ওই আসামি বাবা বলে কাকে ডাকল?

তা জানি না।

নিলয়দার চেয়ে ভোলানাথ বয়সে অন্তত সাত-আট বছর বড়। সে হঠাৎ নিলয়দাকে বাবা বলে ডাকতে গেল কেন কে জানে!

কোর্ট-ইনসপেকটরের মুখখানা দেখলে বেশ সরল, ভালমানুষ মনে হয়। তিনি কাজের ফাঁকে ফাঁকে দু'একবার মুখ তুলে আমাদের দেখছেন। ভোলানাথ আর দু'বার বাবা বলে চেঁচিয়ে উঠল। আমার বুকের মধ্যে কেমন যেন একটা অজানা ভয়ের উত্তেজনার সঞ্চার হচ্ছে। খালি মনে হচ্ছে, এখান থেকে এক্ষুনি চলে গেলে ভাল হয়।

কোট-ইনসপেকটর হাতছানি দিয়ে নিলয়দাকে ডাকলেন। আমিও উঠে গেলাম নিলয়দার সঙ্গে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, আপনাদের কোন কেস?

নিলয়দা বললেন, ওই যে ভেতরে রয়েছে, কাল কালীঘাটে তিন জন মেয়েকে... মানে, অনেকটা ভুল বোঝাবুঝির ব্যাপার।

আমি জোর দিয়ে বললাম, তিন জন মেয়েকে কামড়ে দিয়েছে। একটি মেয়ের বয়েস তেরো চোদ্দ বছর!

নিলয়দা বিরক্ত ভাবে তাকাল আমার দিকে। আমি আরও কিছু বলতে যাচ্ছিলাম, কোর্ট-ইনসপেকটর একটা খাতা উলটে বললেন, হ্যাঁ, কালীঘাটে, মলয়া বোর্ডিং হাউসের সামনে... পেটি কেস! ও-পক্ষের কেউ ডায়েরি করেনি! আসামি আপনাদের কে হয়!

আমি বললাম, কেউ না!

আমাকে থামিয়ে দিয়ে নিলয়দা বলল, আমাদের বিশেষ পরিচিত। দেখুন, ও মানুষটি অতি ভাল, একটু মাথার গোলমাল আছে, বেশির ভাগ সময়ই ঠিক থাকে, মাঝে মাঝে হঠাৎ!

কী বললেন, মাথার গোলমাল আছে!

হ্যাঁ স্যার। তবে ওকে দেখাশুনো করার কেউ নেই তেমন... আপনারা ওকে জেলেই রাখুন, জেলে যদি ওর চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন–

ঠিক আছে, বসুন গিয়ে।

নিলয়দা তবু অনুনয় করে বলল, একটু কনসিডার করবেন। সাধারণ পাগলের মতো ওকে ট্রিট করবেন না। আপনাকে স্পেশালি রিকোয়েস্ট করছি।

এই সময় হাকিম এসে ঢুকতেই সকলে উঠে দাঁড়ালেন। আমরা নিজেদের জায়গায় ফিরে এলাম। এরপর মিনিট পনেরো কিছুই হল না। পেশকারের সঙ্গে হাকিম কী সব কথা বলতে লাগলেন।

প্রথমে অন্য এক জন আসামির নামে হাঁক পড়ল। সওয়াল-জবাব কিছুই হল না। একজন উকিল উঠে দাঁড়িয়ে এক মাস বাদের ডেট চাইলেন, হাকিম তা মঞ্জুর করে দিলেন। দ্বিতীয় আসামির ক্ষেত্রেও সাক্ষী আসেনি, তার উকিল মেডিক্যাল সার্টিফিকেট পড়ে শোনাতে যাচ্ছিলেন, হাকিম বললেন, ঠিক আছে। আপনি কবে তারিখ চান?

ভোলানাথের নামটি আমার দেওয়া, কিন্তু ও নিজে সে নাম বলতে পারে না। পুলিশ কী করে জানল? হরিবাবুর কাছ থেকে শুনেছে? পুলিশ আবার তার সঙ্গে একটা দাস বসিয়ে দিয়েছে। হাঁক পড়ল, ভোলানাথ দাস!

ভোলানাথকে খাঁচা থেকে বার করে এনে দাঁড় করানো হলে কাঠগড়ায়। কোর্ট-ইনসপেকটর বিড় বিড় করে হাকিমকে কী যেন বোঝালেন। হাকিম খস খস করে সই করে দিলেন একটা কাগজে। কোর্ট-ইনসপেকটর মুখ তুলে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, খালাস! আপনাদের লোক নিয়ে যান।

ব্যাপারটা যেন চোখের নিমেষে ঘটে গেল। বিচারের এই নমুনা। আমি উত্তেজনা দমন করতে না পেরে উঠে দাঁড়িয়ে চেঁচিয়ে বললাম, স্যার, আমরা ওর খালাস চাই না! ও পাগল। গভর্নমেন্টের উচিত ওর চিকিৎসার ব্যবস্থা করা।

হাকিম মুখ তুলে ঠাণ্ডা চোখে তাকালেন আমার দিকে। কোর্ট-ইনসপেকটর কঠিন মুখ করে বললেন, ডিসটার্ব করবেন না, বাইরে যান। এক জন উকিল আমাকে বললেন, কী করছেন, ভাই? কনটেমট অফ কোর্ট হয়ে যাবে। বাইরে চলে যান! খালাস পেয়ে গেছেন তো।

ভোলানাথকে ছেড়ে দিতেই সে ছুটে এসে নিলয়দাকে জড়িয়ে ধরে হাউ হাউ করে বলতে লাগল, বাবা বাবাগো, আমার খিদে পেয়েছে। আমাকে ওরা মেরেছে! বাবা, আমাকে বাড়ি নিয়ে চলো।

রুল উঁচিয়ে সেপাই বলল, বাহার যাও! বাহার যাও! হল্লা মাৎ করো। যাও, নিকালো।

কারা যেন প্রায় ঠেলতে ঠেলতেই বার করে দিল আমাদের তিন জনকে। নিলয়দার চোখে জল চিকি চিক করছে। ভোলানাথ ঠিক একটা বাচ্চা ছেলের মতো নিলয়দাকে জড়িয়ে ধরে মাথা ঘষছে তার বুকে।

নিলয়দা ফ্যাকাসে গলায় বলল, কী হয়ে গেল বল তো, নীলু? ভাবতেই পারিনি যে এ-রকম হবে।

নিলয়দার ওপর আমার এমন রাগ হচ্ছে যে, ওর দিকে আমার আর তাকাতেই ইচ্ছে করছে না। নিলয়দারই তো সব দোষ! কোর্ট-ইনসপেকটরের সঙ্গে ও-রকমভাবে কথা বলতে গেল কেন? চেনা লোককে জেল খাটানোর জন্য কেউ কাকুতি মিনতি করে? সরকার একটা পাগল ক্রিমিনালের দায়িত্ব নিতে চায় না, সে-দায়িত্ব চাপিয়ে দিল নিলয়দার ঘাড়ে। এখন ভোলানাথকে আমরা কোথায় নিয়ে যাব?

কোর্টের বাইরে বেরিয়ে আমরা কেন যে ডান দিকে না গিয়ে বাঁ-দিকে হাঁটতে লাগলাম তা আমরা কেউই জানি না। ভোলানাথ নিলয়দার হাত জড়িয়ে ধরে অনবরত বক বক করে যাচ্ছে। সম্পূর্ণ অসম্বন্ধ প্রলাপ। রাস্তার লোকেরা আমাদের এ-দিকে ফিরে ফিরে দেখছে।

একজায়গায় ভোলানাথ থমকে দাঁড়িয়ে গিয়ে এ-এ-এ-এ আওয়াজ করতে লাগল। মুখটা ফাঁক, তার জিভটা বেরিয়ে এসেছে, চোখ দুটো জ্বল জ্বল করছে। দুটি মেয়ে রাস্তা পার হয়ে আসছে আমাদের দিকে, ভোলানাথের চোখ সেই দিকে।

আমি মেয়ে দুটিকে আড়াল করে ভোলানাথের মুখোমুখি দাঁড়ালাম। আমার চোয়াল শক্ত হয়ে গেছে। ভোলনাথকে বুকে একটা ধাক্কা দিয়ে বললাম, ফের যদি তুমি কোনও মেয়ের দিকে তাকাও, আমি তোমার সবকটা দাঁত ভেঙে দেব।

আগে পাগল দেখলেই আমি সাঙ্ঘাতিক ভয় পেতাম, অথচ আজ আমার এতখানি সাহস হল কী করে? মরীয়া হয়ে উঠলে বোধহয় সব মানুষই সাহসী হয়।

আমার শাসানি শুনে ভোলনাথ নিলয়দাকে চেপে ধরে বলল, বাবা, আমাকে মারবে। আমাকে মেরো না। আমার খিদে পেয়েছে।

এতক্ষণ নিলয়দার সঙ্গে কথা বলিনি, তবু এবার বলতেই হল, নিলয়দা এই ভাবে ওকে রাস্তা দিয়ে নিয়ে যাওয়া যাবেনা। দুপুরবেলা ডালহৌসিতে অনেক মেয়ে।

নিলয়দা বলল, ওই তো একটা ট্যাক্সি আসছে। ওটা ধরা যাক। কিন্তু যে খিদে পেয়েছে বলছে?

নিলয়দা ভোলানাথকে নিয়ে ট্যাক্সিতে উঠল, আমি রাস্তার ধারে একটা লোক ভুট্টা পোড়াচ্ছিল, তার কাছ থেকে দুটো ভুট্টা কিনে আনলাম। ভোলানাথ সেই ভুট্টা দুটো নিয়ে ডাটা-ফাটাসুদ্ধ চিবিয়ে খেতে শুরু করে দিল।

ট্যাক্সিওয়ালা জিজ্ঞেস করল, কোথায় যাবেন?

নিলয়দা আমার দিকে অসহায় ভাবে তাকাল। আমি কঠিন মুখ করে বললাম, গঙ্গার ধারে।

গতকাল সন্ধ্যায় যেখানে স্বর্ণরসঙ্গে নৌকোয় চেপেছিলাম, ঠিক সেই জায়গার কাছাকাছি আসতেই আমি ট্যাক্সি থামাতে বললাম। নিলয়দাকে বললাম, এখানে নামো। ট্যাক্সিওয়ালাকে বললাম, আপনি একটু অপেক্ষা করুন ভাই।

যেন আমিই বয়েসে বড়, নিলয়দা আমার কথা শুনতে বাধ্য। ছেলের মতো নেমে পড়ল। ভোলানাথও নামল। প্রথম ভুট্টাটা শেষ করে সে এখন দ্বিতীয়টা খাচ্ছে কচরকচর করে। গোটা একটা আস্ত ভুট্টা যদি কেউ খায়, তা কি তাকিয়ে দেখা যায়? আমি ওর দিকে চোখই ফেলছি না। ও কিন্তু নিলয়দার একটা হাত চেপে ধরে আছে।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, হোয়্যার ডু ইউ ইনটেন্ড টু টেক হিম নাউ, নিলয়দা?

কোথায় যাওয়া যায় বল তো! হরিবাবুর কাছে তো যাওয়া আর সম্ভব নয়। ও-পাড়াতেই ঢোকা যাবেনা।

লেট মি টেল ইউ ফ্র্যাংকলি, নিলয়দা। আই থিঙ্ক উই শুড ড্রপ দিস লুনাটিক হিয়ার, অ্যান্ড রান অ্যাওয়ে! দেয়ার ইজ নো আদার অলটারনেটিভ!

আমার কথাগুলো যেন বুলেটের মতো নিলয়দার বুকে বিঁধল। বর্ণহীন হয়ে গেল মুখখানা। খাওয়া থামিয়ে ভোলানাথ আমার মুখের দিকে চেয়ে রইল এক দৃষ্টে। ও কি তাহলে ইংরিজি বোঝে?

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে নিলয়দা বলল, তুই ঠিকই বলেছিস। সেটাই করা উচিত, কিন্তু আমি তা পারব না।

কেন পারবে না? এই গঙ্গার ধারে কত সাধু-সন্ন্যাসী, যোগী, পাগল থাকে। এদের মধ্যে ওর জায়গা হয়ে যাবে।

ওর এখন যা অবস্থা, যে-কোনও মুহূর্তে ভায়োলেন্ট হয়ে যেতে পারে। গঙ্গার ধারে অনেক ছেলে-মেয়ে বেড়াতে আসে। এখানে কোনও মেয়েকে অ্যাটাক করলে ও লিনচড হয়ে যাবে। লোকে মেরে ওকে গঙ্গার জলে ফেলে দেবে! আমার হাতটা ও কীভাবে চেপে ধরে আছে দেখ, কী করে ছাড়িয়ে নেব? যদি জোর করে ছাড়িয়ে নিয়ে পালিয়ে যাই, তারপর বাকি জীবনটা আমার কীভাবে কাটবে? এক দিনের জন্যও কি শান্তি পাব? সবসময় মনে হবে না যে আমি একজন মানুষের মৃত্যুর জন্য দায়ী?

নিলয়দার দু'চোখ দিয়ে নেমে এল জলের ফোঁটা। পকেট থেকে রুমাল বার করে নিলয়দা মুখটা ফিরিয়ে নিল।

আমি কয়েক পা সরে গিয়ে একটা সিগারেট ধরালাম। আমার চোখের সামনে একটা দৃশ্য ভেসে উঠল। স্বর্ণ আর জয় এখানে বেড়াতে এসেছে, হঠাৎ ভোলানাথ পেছন থেকে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল স্বর্ণর ওপর। জয় তখন কী করবে? ভয় পেয়ে পালাবে না বীরবিক্রমে ভোলানাথকে মারতে শুরু করবে? আমহার্স্ট স্ট্রিটে গিয়ে স্বর্ণ নিলয়দাকে বলছে, নিলয়দা, তোমার সেই পোষা পাগলটিকে আমার হৃদয়েশ্বর আজ খুন করেছে। আজ থেকে দিদির আর কোনও চিন্তা নেই।

আজকের ঘটনা শুনে স্বর্ণ নিশ্চয়ই ভাববে, আমি আর নিলয়দা যুক্তি করে কোর্টে গিয়ে, ভাল উকিল লাগিয়ে ভোলানাথকে ছাড়িয়ে এনেছি। নিলয়দা গলা পরিষ্কার করে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, কোনও নার্সিং হোমে ওকে ভর্তি করা যায় না? মেন্টাল পেসেন্টদের জন্য নিশ্চয়ই নার্সিংহোম আছে।

কিন্তু নিকট আত্মীয় না হলে যে ভর্তি করানো যায় না?

আমি নিকট আত্মীয় বলে পরিচয় দেব। বলব, আমার দাদা। কেউ কি আমার নামে অভিযোগ করতে যাবে? কে অভিযোগ করবে?

নার্সিংহোমেও কত দিন থাকবে?

যে ক'টা দিন আমি চালাতে পারি।

নিলয়দা, এ বিষয়ে আমার কোনও মতামত নেই।

সে যাই হোক, এক্ষুনি তো ভর্তি করা যাচ্ছে না। সে-রকম নার্সিং হোম খুঁজে বার করতে হবে। আজকের দিনটা ওকে বাড়িতে রাখা ছাড়া আর তো কোনও উপায় দেখছি না।

কার বাড়িতে? তোমার বাড়িতে নিয়ে যাবে?

অতি দুঃখীর মতো হেসে নিলয়দা বলল, আর কার বাড়িতে জায়গা পাব, বল? চল, এখানে আর দাঁড়িয়ে থেকে লাভ নেই।

নিলয়দা, তুমি যাও। আমি এখন এখানেই একটু থাকব একলা একলা!

রূপার বকুনির ভয় পাচ্ছিস, না? সেই ভাল, তোর আর যাবার দরকার নেই। তুই কেন শুধু শুধু বকুনি খেতে যাবি। আমি একলাই ঠিক ম্যানেজ করে নেব।

নিলয়দার ওপর এর পরেও কি রাগ করে থাকা যায়? দুরু দুরু বুকে আমাকে যেতে হল সঙ্গে।

রূপাবউদি অফিসে গেছে, ফিরবে সাড়ে পাঁচটায়। পাপুন ফিরে এসেছে স্কুল থেকে। একটা আইসক্রিম চুষতে চুষতে আহ্লাদিত মুখে পাপুন বলল, পাগলটা আবার এসেছে? বেশ মজা হবে! মা আসুক না!

ভোলানাথ আজ খুবই অশান্ত। হা-হা করে হাসছে, কখন কেঁদে ফেলছে, ঘরের মধ্যে দরজা বন্ধ করে রাখলেও দুম দুম করে ধাক্কা দিচ্ছে দরজায়। আজ যদি একটু চুপচাপ ভদ্র হয়ে থাকত।

নিলয়দা বলল, নীলু, তুই ডাক্তার ভড়কে একটা ফোন কর। ইঞ্জেকশন দিয়ে একে ঘুম পাড়ানো দরকার। রূপা আসবার আগেই যদি ঘুম পাড়িয়ে ফেলা যায়।

ডাক্তার ভড়কে আমি ফোন করে পেলাম না। ওঁর চেম্বার থেকে জানাল যে, উনি সাতটার সময় সেখানে আসবেন, তার আগে তাকে পাবার কোনও উপায় নেই।

ভোলানাথ এত জোর দরজা ধাক্কা দিচ্ছে যে, খুলে না দিয়ে উপায় নেই। মাথার ব্যান্ডেজটা সে খুলে ফেলেছে, কপালের ওপরতার দগদগে ক্ষত। নিলয়দা বলল, ভোলানাথ, আজ গণ্ডগোল করো না। ভেতরে গিয়ে বসো, আমি তোমার কপালে ওষুধ লাগিয়ে দিচ্ছি!

ভোলানাথ গর্জন করে বলল, আমি ভাত খাব। আর দই খাব।

ঠিক সেই সময় ফিরে এল রূপাবউদি। সদর দরজা খোলা ছিল, উঠোনে পা দিয়েই থমকে দাঁড়াল, মুখখানা বদলে গেল চোখের নিমেষে। বেশ হাসিমুখে মেজাজেই বাড়িতে এসেছিল, সেই হাসিটা মুছে গিয়ে যা ফুটে উঠল, তা ভয় নয়, ঘৃণা। নিচের ঠোঁটটা কামড়ে ধরে অস্ফুট গলায় বলল, ওকে আবার নিয়ে এসেছ, তুমি যে কথা দিয়েছিলে...।

নিলয়দা ভোলানাথকে জোর করে ঠেলে ঘরের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে দরজা বন্ধ করে দিল। তারপর ব্যাকুল ভাবে বলল, শোনো রূপা, আমি বুঝিয়ে বলছি।

তীক্ষ্ণ গলায় রূপাবউদি চেঁচিয়ে উঠল, পাপুন, তুই চলে আয় আমার সঙ্গে।

রূপা, শোনো- ।

রূপাবউদি আর পাপনের অপেক্ষা করল না। পেছন ফিরেই দৌড়াতে শুরু করল।

আমি বললাম, নিলয়দা, তুমি যাও, বউদিকে ধরো।

অবসন্ন ভাবে নিলয়দা বলল, তুই যা নীলু, তোর কথা শুনবে। আমি আর পারছি না।

আমি বাইরে এসে দেখি রূপাবউদি বেশ জোরে ছুটছে। রাস্তার লোক হাঁ করে দেখছে তাকে। মেঘলা আকাশে ঘনিয়ে এসেছে অকালসন্ধ্যা। বিবেকানন্দ রোডদিয়ে একটা মিছিল যাচ্ছে, কালোয়ারদের দোকানে কীসের যেন চ্যাঁচামেচি, কয়েকটা বাচ্চা ছেলে মাঝরাস্তায় ছোটাছুটি করছে একটা ঘুড়ি ধরার জন্য, এই সব কিছুর মধ্য দিয়ে আমি দৌড়োত লাগলাম। রূপাবউদির যখন মেজাজ ভাল থাকে, তখন অনেক রকম মজা করে, কিন্তু রাগলে একেবারে গণ্ডারের মতো একমুখী। তখন আর কোনও কথা মনে থাকে না! শহরের রাস্তা দিয়ে কোনো ভদ্রমহিলা কি এ-রকম ছোটে?

পেছন থেকে ডেকে কোনও লাভ নেই, আমি একেবারে সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়লাম। হাত জোড় করে বললাম, বউদি, শোনো- ।

আমাকে এক ধাক্কায় সরিয়ে দিয়ে রূপাবউদি ছুট দিল। এবারে আমি রূপাবউদির হাত চেপে ধরে বললাম, শোনো, কী করছ।

ছেড়ে দাও আমাকে। আমি ও-বাড়িতে আর কোনও দিন যাবনা!

ঠিক আছে, আমি তোমাকে বাপের বাড়িতে পৌঁছে দিচ্ছি, এ-রকম ভাবে ছুটছ কেন?

আমাকে পৌঁছে দেবে... কেন? আমি নিজে যেতে পারি না। আমি বাপের বাড়িতে যাব না, আমার যেখানে ইচ্ছে চলে যাব। ছাড়ো আমাকে ইতর কোথাকার! একটা পাগলা কুকুর, যে মেয়েদের দেখলেই কামড়ে দেয়, তাকে তোমরা বাড়িতে নিয়ে আসবে। কেন, আমি জানি! আমাদের অপমান করবার জন্য।

এবার ওকে ইচ্ছে করে আনা হয়নি।

ছাড়ো আমাকে!

কী করছ, রূপাবউদি? লোকে ভাববে, আমি তোমাকে জোর করে ধরে নিয়ে যাচ্ছি।

ছাড়ো, নইলে আমি চ্যাঁচামেচি করব। আমি তোমাদের সবাইকে ঘেন্না করি।

সময় পাপুন এসে হাজির হয়ে বলল, মা!

রূপাবউদি বলল, চল পাপুন, আমরা চলে যাই!

এতক্ষণ রূপাবউদি রাগে ঠকঠক করে কাঁপছিল, এবারে হঠাৎ খুব শান্ত অথচ দৃঢ় গলায় বলল, নীলু, আমাদের আটকাবার চেষ্টা কোরো না।

দু'চার জন কৌতূহলী লোক জমে গেছে আশেপাশে। এখন আর জোর করা যুক্তিযুক্ত নয়। আমি চুপ করে গেলাম। একটা রিকশা ডেকে রূপাবউদি পাপুনকে নিয়ে উঠে পড়ল। অফিস থেকে ফিরে ক্লান্ত অবস্থায়, এক কাপ চা-ও না খেয়ে রূপাবউদি চলে যাচ্ছে বাড়ি ছেড়ে, এই অপমান সে কোনও দিন ভুলবে?

ফিরে এসে দেখলাম, নিলয়দা দেয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আমি ঝাঁঝালো ভাবে বললাম, আমাকে পাঠাবার কোনও মানে হয়! তোমার নিজের যাওয়া উচিত ছিল, রূপাবউদি কোথায় চলে গেল কে জানে!

নিলয়দা হাত বাড়িয়ে ধীর গলায় বলল, একটা সিগারেট দে। আমি মন ঠিক করে ফেলেছি। কালকেই সব ব্যবস্থা করে ফেলব। ভোলানাথের জন্য আর কারুকে ভাবতে হবে না।

৯-১০. হাওড়া পেরিয়ে

হাওড়া পেরিয়ে আমাদের জিপটা বম্বে রোডে পড়ল প্রায় বেলা এগারোটায়। নিলয়দা নিজেই জিপ চালাচ্ছে। অনেক ভেবেচিন্তেই আমরা ড্রাইভার নিইনি।

কাল অনেক রাত পর্যন্ত নিলয়দা আর আমি এই পরিকল্পনাটা নিয়ে আলোচনা করেছি। আমাদের ইচ্ছে ছিল খুব ভোরবেলা বেরিয়ে পড়ব। কিন্তু জিপটা ভাড়া করার পর দেখা গেল গিয়ারে একটু গোলমাল আছে। এর চেয়ে ভাল জিপ পাওয়া গেল না, এটাকেই সারিয়ে, ট্রায়াল দিয়ে নিতে হল। নিলয়দা সকালে যতক্ষণ জিপটা নিয়ে ব্যস্ত ছিল, সেই সময় আমাকে একবার যেতে হয়েছিল স্বর্ণদের বাড়িতে।

রূপাবৌদি কাল রাত্তিরে ও-বাড়িতে আসেনি। তার জন্য অবশ্য দুচিন্তার কিছু নেই। রূপাবউদি ছেলেমানুষ নয়, পাপুনকে নিয়ে যখন গেছে, তখন কোথাও হারিয়ে যাবে না। পাছে এ-বাড়িতে ওর খোঁজ করতে আসি, সেই জন্য অন্য কোনও বন্ধু-টন্ধুর বাড়িতে চলে গেছে নিশ্চয়ই। সকালেও রাগ পড়েনি। আমি স্বর্ণকে বাড়ির চাবি দিয়ে বললাম, আমরা দু'দিনের জন্য কলকাতার বাইরে যাচ্ছি, পুরুলিয়ার একটা হাসপাতালে ভোলানাথকে রেখে আসব। রূপাবউদিকে বোলো, ভোলানাথ আর কোনও দিন ওবাড়িতে আসবেনা। নিলয়দা এই শেষবারের মতো রূপাবউদিকে ক্ষমা করতে বলেছে।

আমরা গাড়িতে যাব শুনে স্বর্ণ আরদার ধরল, তাকেও সঙ্গে নিয়ে যেতে হবে। তাকে বোঝানো মহা মুশকিল। বাঘ, ছাগল আর পানের একটা ধাঁধা আছে না, যাতে কিছুতেই ওদের এক সঙ্গে এক নৌকোয় নিয়ে যাওয়া যায় না? স্বর্ণকে দেখলে ভোলানাথের ক্ষেপে ওঠার ব্যাপার তো আছেই, তাছাড়া স্বর্ণ যদি আমার পাশে বসে অবিরল ওয়াটারপ্রুফের বাড়ির ছেলেটির কথা বলে যায়, তাহলে আমিই বোধহয় পাগল হয়ে যাব।

স্বর্ণর কাছ থেকে প্রায় পালিয়েই আসতে হয়েছে আমাকে।

নিলয়দার পাশে বসেছি আমি। পেছনের লম্বা সিটে কাত হয়ে শুয়ে আছে ভোলানাথ। মাঝ মাঝে আপন মনে কথা বলছে। কাল ও সর্বক্ষণ বাবা, বাবা করছিল। আজ আবার মাঝে মাঝেই মাধুরী বলে কারুর নাম উচ্চারণ করছে, যেন তাকে উদ্দেশ করেই জানাচ্ছে অনেক অভিযোগ। সে ওর যা ইচ্ছে বলুক, আর ওর ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামাবার দরকার নেই। ওর নিয়তি নির্দিষ্ট হয়ে গেছে।

নিলয়দা বলল, কোলাঘাটে একটা ভাল হোটেল আছে। সেখানে আমরা লাঞ্চ খেয়ে নেব। ওখানে ইলিশ মাছ পাওয়া যেতে পারে।

আমি বললাম, কোলাঘাটে থামতে গেলে দেরি হয়ে যাবে। সন্ধের আগেই আমাদের পৌঁছানো দরকার।

তা বলে দুপুরে কিছু খাব না?

টেনে চলো খড়্গপুর। ওখানে রাস্তার পাশেই একটা বড় ধাবা আছে, সেখান থেকে কিছু খাবার তুলে নেব। দেড়টার মধ্যে তোমার খড়্গপুর পৌঁছে যাওয়া উচিত।

ঠিক আছে, তাই চল। ফ্লাস্কটা বার কর, একটু চা খেয়ে নিই।

খানিক দূর যাবার পর নিলয়দা জিজ্ঞেস করলো, হ্যাঁ রে নীলু, শেষ পর্যন্ত আমরা ভুল করছি না তো?

না, নিলয়দা। কাল রাত্তিরে তো আমরা অনেক ভেবেচিন্তে দেখলাম। তুমি যা ঠিক করেছ, সেইটেই ওর পক্ষে বেস্ট! ওকে আর কে নেবে বলো, প্রকৃতি ছাড়া?

পুলিশ ওকে নেবেনা। ওর আত্মীয়-স্বজন ওকে ত্যাগ করেছে। হাসপাতালে বে-ওয়ারিশ পাগল নেয় না। রাস্তায় ও কোনও গণ্ডগোল করলে লোকে ওকে পিটিয়ে মেরে ফেলতে চায়। তাহলে ও কোথায় যাবে? একমাত্র ওকে প্রকৃতির কোলেই ফিরিয়ে দেওয়া যায়। বুঝলি নীলু, একদিন হয়তো আমাদের সবাইকে প্রকৃতির কাছে ফিরে যেতে হবে।

আমি তাতে রাজি আছি। কিন্তু তার আগে সমস্ত শহরগুলো ধ্বংস করে দেওয়া দরকার।

ও নিজের খাবার জোগাড় করতে পারবে?

কাল তুমি ওর ভুট্টা খাওয়া দেখলে না? আমরা শুধু দানাগুলো খেয়ে বাকি সবটা ফেলে দিই। ও সবটাই খেয়ে ফেলল কচ কচ করে খিদের মুখে। এখন পর্যন্ত ওর পেট খারাপ হওয়ার কোনও লক্ষণ নেই। খিদে পেলে মানুষ সব খেতে পারে। যারা অসুখ নিয়ে চিন্তা করে না, তাদের সব কিছুই হজম হয়ে যায়। আদিম জংলি মানুষরা যে-রকম ভাবে বাঁচত, ভোলানাথও সেই ভাবেই বাঁচার চেষ্টা করবে।

আগে জঙ্গলে অনেক রকম ফল-টল পাওয়া যেত, শিকার করার মতো অনেক জন্তু ছিল। এখন তো কিছুই বলতে গেলে নেই।

জানো নিলয়দা। আমি একবার লোধাদের একটা বিয়ে দেখেছিলাম। খুব ইন্টারেস্টিং। একটা লোধা জোয়ান ছেলে একটা বড় শালগাছের তলা থেকে ছুটতে আরম্ভ করে একটা টিলার মাথায় উঠে গেল। আবার সেখান থেকে ফিরে এসে মেয়েপক্ষের লোকদের বলল, এই যে ছুটে গেলাম, এই এতখানি জঙ্গল আমার। তার মানে কিন্তু ওই ছেলেটো যে অতখানি জঙ্গলের মালিক, তা নয়। সে বলতে চায় যে, জঙ্গলের ওই অতটা এলাকা হল তার শিকার আর ফল-মূল ইত্যাদি শিকার সংগ্রহ করার সীমানা। জঙ্গলের কোনও প্রাণী, এমনকী ইঁদুর-বাদুড়ও ওরা বাদ দেয় না, বেশ আরাম করে খায়। ইংরেজিতে যাকে বলে মাসরুম, আমরা বলি ব্যাঙের ছাতা, তাকে ওরা বলে ছাতু, ওদের খুব প্রিয় খাদ্য। কাজেই বুঝতে পারছ, জঙ্গল থেকে অনেক মানুষ এখনও তাদের খাদ্য সংগ্রহ করে বেঁচে আছে। তাদের স্বাস্থ্যও বেশ ভাল।

আমি সাঁওতালদের শালগাছের ফুল খেতে দেখেছি।

কুসুম ফল বলে এ-রকম ফল আছে জানো? অনেকে সেই ফলের নামই জানে না। যখনও দেখেওনি। এ-দিককার জঙ্গলে খুব পাওয়া যায়। সেই ফল খেয়ে অনেকে পেট ভরায়। গত বছর কাঁকড়াঝোড়ে এসে আমরা কত বুনো জাম গাছ দেখেছিলাম, মনে আছে?

সব চেয়ে বড় কথা, জঙ্গলে কোনও মেয়ে নেই। কয়েক মাস ও যদি একদম কোনও মেয়েকে দেখতে না পায়, তাহলে বোধহয় ও সুস্থ হয়েও যেতে পারে। ওইটাই তো ওর একমাত্র প্রবলেম।

নদীর ধারে শুয়ে থাকবে, চিৎ হয়ে শুয়ে শুয়ে নীল আকাশ দেখবে, সবুজ বন ওর চোখ জুড়িয়ে দেবে, প্রকৃতির শুশ্রূষায় ও অনেক ভাল থাকবে।

ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের লোক যদি ওকে দেখতে পায়?

ও তো আর কাঠ চুরি করবে না, ওর ভয় কী? জঙ্গলের মধ্যে কোনও মানুষের থাকা তো বারণ নয়। সরকারের সেরকম কোনও নিষেধাজ্ঞা আছে বলে শুনিনি।

এক মাস বাদে আমরা আর একবার এসে ওর খোঁজ নিয়ে যাব। কী বল?

না নিলয়দা, তুমি প্রতিজ্ঞা করেছ, আমরা ওকে প্রকৃতির কাছে সঁপে দিয়ে যাব, তারপর আর ওর সঙ্গে আমাদের কোনও সম্পর্ক থাকবেনা।

নিলয়দা ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল ভোলানাথের দিকে। ও আমাদের কথা বুঝতে পারছে কি না কে জানে! অবশ্য ইঞ্জিনের শব্দে আমাদের আস্তে আস্তে কথা বলা ওর ঠিক শুনতে পাবার কথা নয়। ভোলানাথের চোখে-মুখে এখন আর একটুও হিংস্রতার ছাপ নেই। কেমন যেন ভাবের ঘোরে তন্ময় হয়ে আছে। কাল রাত্রে ড. ভড় এসে দুটো ইঞ্জেকশান দিয়ে যাওয়ায় ওর বেশ উপকার হয়েছে। ওষুধ লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে ওর ক্ষতগুলোতে। আশ্চর্য অত মার খেয়েও... পাগল ছাড়া অত মার আর কেউ সহ্য করতে পারে না।

নিলয়দার সঙ্গে চোখাচোখি হতেই ভোলানাথ বলল, মাধুরী মরে গেছে, আমিও মরে গেছি। আর কেউ বেঁচে নেই। এটাই হল সত্যি কথা, তাই না?

নিলয়দা জিজ্ঞেস করল, ভোলানাথ, কে মাধুরী? সে কোথায় থাকে? তোমার কিছু মনে পড়ছে?

ভোলানাথ বলল, তুমি আমাকে চেনো না, আমি তোমাকে চিনি না। কেউ কারুকে চেনে না, এই হল সোজা কথা, ব্যাস!

ভোলানাথের মুখে এই কথা আমি এতবার শুনেছি যে এখন একঘেয়ে লাগে। নিলয়দা কিন্তু আবেগের সঙ্গে বলল, সত্যিই ভোলনাথ, তোমাকে আমরা চিনতে পারলাম না শেষ পর্যন্ত।

রূপনারায়ণ নদীর ব্রিজ পার হবার সময় নিলয়দা বলল, কোলাঘাটে থামাব না? এখানে ভাল খাবার ছিল, ওকে শেষবার একটু ইলিশ মাছ খাইয়ে দিতাম।

আমি বললাম, অ্যাকসিলারেটারে একটু জোরে চাপ দাও, নিলয়দা। সন্ধের আগে না পৌঁছতে পারলে আমরা মহা মুশকিলে পড়ে যাব।

জীপের স্পিড বাড়িয়ে খড়্গপুরে আমরা পৌঁছে গেলাম দেড়টার মধ্যে। এবারে এখান থেকে কিছু খাবার নিয়ে নিতে হবে। বড় ধাবাটায় বেশ ভিড়। দু তিনখানা গাড়ি থেমে আছে। তিন জন মহিলা রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে হাস্য পরিহাস করছে, অবাঙালি, খুব সম্ভবত পাঞ্জাবি।

নারীকণ্ঠ শুনেই উৎকর্ণ হয়ে উঠল ভোলানাথ। বাইরের দিকে ঝুঁকে পড়ে ঘড়ঘড়ে গলায় বলল, মাধুরী, ওখানে কী করছে? মাধুরীর কপালে রক্ত! মাধুরী! মাধুরী।

নিলয়দা বলল, মাধুরী বলে কাকে ডাকছে। ওদের মধ্যে কারুকে চিনতে পেরেছে?

আমি বললাম, অধরা মাধুরী আর ছন্দ বন্ধনে ধরা দেবে না। ওর কথায় কান দিও না, নিলয়দা। ওর অতীত খোঁড়ার চেষ্টা করে আর কোনও লাভ নেই। আমরা পরের ধাবায় যাব, তুমি গাড়ি স্টার্ট দাও!

ভোলানাথ জীপ থেকে লাফিয়ে বাইরে নামার উপক্রম করেছিল, জিপটা আবার চলতে শুরু করতেই ও ঝাঁকুনিতে বসে পড়ল।

পরের ধাবাটি ছোট, এখানে শুধুট্রাক ড্রাইভাররা খাবার জন্য থামে। সম্পূর্ণ স্ত্রী-ভূমিকাবর্জিত। এখানে আমরা জীপ থেকে তিন জনেই নেমে একটা খাটিয়ায় বসলাম। গরম গরম মাংসের তরকা আর রুটি, সেইসঙ্গে পেঁয়াজ আর কাঁচা লঙ্কা। অতি উপাদেয় খাদ্য।

আমি তরকাটাই বেশি খেলাম, রুটির ভক্ত নই বলে দু'খানা নিয়ে দেড়খানাতেই আহার সমাপ্ত করলাম। নিলয়দা খেল তিনখানা রুটি। ভোলানাথকে প্রথম যে তিনখানা রুটি দেওয়া হল তা সে চোখের নিমেষে শেষ করে ফেলল, তরকা-পেঁয়াজ ছুঁলই না। আবার তিনখানা দেওয়া হল, তারও সেই অবস্থা। নিলয়দা পরিবেশনকারীকে চোখের ইঙ্গিতে জানাল, দিয়ে যাও।

ফাঁসির আসামির খাওয়ার কথা শুনেছিলাম। ভোলানাথ কি বুঝতে পেরেছে যে ও নির্বাসনে যাচ্ছে? আমি গুনছিলাম, ঠিক সাতাশখানা রুটি ও উড়িয়ে দিল বিনা বাক্যব্যয়ে। তারপর সর্দারজি এসে বলল, আউর রোটি নেহি হ্যায়, পাকা দেঙ্গে জলদি?

আমি বললাম, থাক, যথেষ্ট হয়েছে। এরপর অসুস্থ হয়ে পড়বে। ওহে ভোলানাথ, এবারে উঠে পড়ো, যেতে হবে।

মুখের কথা সে শুনল না, তার হাত ধরে টানতে হল। তখন সে প্লেটটা সুদ্ধুই এগোতে লাগল গাড়ির দিকে। প্লেটটা তার হাত থেকে কেড়ে নেবার চেষ্টা করতেই সে সেটা মুখের সামনে নিয়ে গিয়ে তরকা চাটতে লাগল জিভ দিয়ে। তার দাড়িতে লেগে গেল অনেকটা।

তার মুখ দেখে মনে হয়, এখন তার একটুও পেট ভরেনি। মানুষের এ-রকম অস্বাভাবিক ক্ষুধা দেখলে গা ছম ছম করে।

বাহারাগোড়া থেকে ঝাড়গ্রামের দিকে ঘুরে যাবার মুখটাতেই জিপটা গণ্ডগোল শুরু করল। মাঝে মাঝেই স্টার্ট বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। এতক্ষণ তো আমরা প্লেন রাস্তায় এসেছি, এর পরে জঙ্গলের মধ্যে পাহাড়ি রাস্তায় যদি গাড়ির গোলমাল হয়, তাহলে খুব বিপদে পড়ে যাব। বাহারাগোড়ার পাম্প থেকে আমরা পেট্রল ভরে নিয়েছি একটু আগে, আমি সেখানে ফিরে গিয়ে একজন মিস্ত্রিকে ধরে আনলাম।

মিস্ত্রিটি সব প্লাগগুলো খুলে পরীক্ষা করে দেখছে, আমি রাস্তায় দাঁড়িয়ে সিগারেট টানছি, একটা সাদা রঙের গাড়ি আমাদের পাশ কাটিয়ে চলে গেলঝা ড়গ্রামের দিকে। পেছনের সিটে জানলার পাশে বসে থাকা মানুষটিকে দেখে আমার শরীরে একটা শিহরণ খেলে গেল। সাত্যকি বসুমল্লিক। আমার চিনতে কোনও ভুল হয়নি। সেই অহঙ্কারী, সুন্দর মুখ, ঠোঁটের রেখায় অবজ্ঞা মেশানো ভদ্রতা। লোকটা এ-দিকে কোথায় যাচ্ছে? আমাকে দেখতে পায়নি। দেখলেও কি থামত? একটা ডাকবাংলোয় কয়েকদিনের জন্য বাধ্যতামূলক পরিচয়। সাত্যকি বসুমল্লিকের মতো মানুষ এইসব ঘটনা মনে রাখে না। কিন্তু ও কেন বলেছিল, আমার মতো একটা ছেলেকেই ও খুঁজছে। নিছক কথার কথা?

আমি এমনই উত্তেজিত বোধ করলাম যে, মনে হল, এই কথাটা এক্ষুনি কারুকে জানানো দরকার। কিন্তু কাকে বলব? নিলয়দাকে বললে কিছুই বুঝবে না। কলকাতা থেকে কত লোকই তো ঝাড়গ্রামে যায়, অনেকের বাড়ি আছে ঝাড়গ্রামে, সাত্যকি বসুমল্লিকেরও বাড়ি থাকাটা কিছুই অস্বাভাবিক নয়।

মিস্ত্রিটি বেশ ভাল, কিছুক্ষণের মধ্যেই চাঙ্গা করে দিল আমাদের জিপটা। এবং এই কাজের জন্য সে নিজেই মাত্র দশ টাকা চাইল। এই রকম কাজ আমার ভাল লাগে, দরাদরি করতে হয় না, দু'পক্ষই খুশি।

ঝাড়গ্রামে আমার অনেক চেনা লোক। যদিও নিলয়দা আর আমি মনে মনে যে যুক্তি মেনে নিয়েছি তাতে কোনও খুঁত নেই, তবু আমরা ঠিক করেছি, যে কাজটা আমরা করতে বেরিয়েছি, সেটা গোপনে সেরে নেওয়াই ভাল। ঝাড়গ্রামে আমার চেনা কারুর সঙ্গে দেখা হয়ে গেলেই মুশকিল, তারা নানা কথা জানতে চাইবে, দু'একজন হয়তো সঙ্গে যেতেও চাইবে। আমি মাথায় একটা রুমাল বেঁধে নিলয়দার সানগ্লাসটা পরেনিলাম, মুখটাও ফিরিয়ে রাখলাম ভেতরের দিকে। অবশ্য সাত্যকি বসুমল্লিকের সাদা গাড়িটা লক্ষ করার ইচ্ছে ছিল আমার, কিন্তু সেটা আর দেখা হলো না।

আমরা হাজারিবাগ, বেতলা, সিমলিপাল এইসব কাছাকাছি সবকটা জঙ্গলের কথাই পর্যালোচনা করেছি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কাঁকড়াঝোড় জঙ্গলটাই ঠিক করা হয়েছে। গতবারেই এই জঙ্গলটা ঘুরে গেছি বলে এটার কথাই মনে পড়েছে সব চেয়ে আগে। তাছাড়া, এই জঙ্গলে বাঘ নেই, নেকড়ে যে নেই তাতেও আমরা নিঃসন্দেহ হয়েছি, অন্য কোনও হিংস্র জানোয়ারই নেই। হাতি আছে বটে, হাতি প্রায়ই আসে, কিন্তু হাতি তো চট করে মানুষকে আক্রমণ করে না। শহরে ক্ষুব্ধ জনতার চেয়ে বুনো হাতির পাল অনেক বেশিভদ্র।

নিলয়দার তুলনায় আমি এ অঞ্চলে অনেক বেশিবার এসেছি, রাস্তাঘাট আমিই বেশি চিনি। যদিও বেলপাহাড়ি ছাড়বার পর জঙ্গলের পথ বেশ জটিল, মাঝে মাঝে যেমন খাড়াই-উৎরাই আছে তেমনই এক-এক জায়গায় পথ এমনভাবে ভাগ হয়ে গেছে যে কোন দিকে যেতে হবে তা ধরা মুশকিল। এই অঞ্চলের ড্রাইভাররাই সঠিক পথ জানে।

দহিজুড়ির মোড় একটা ছোট ঝঞ্ঝাট হল। সেখানে আজ হাটবার, জিপটা চলেছে আস্তে আস্তে, হঠাৎ ভোলানাথ একজায়গায় একটা লাফ দিল। ও পালাতে চেয়েছিল না হাটের কোনও মেয়েকে কামড়াবার শখ হয়েছিল তা ঠিক বোঝা গেল না। লাফিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ে যাবার পর উঠে দাঁড়িয়ে চ্যাঁচাতে লাগল, মাধুরী মরে গেছে, আমি মরে গেছি, সবাই মরে গেছে। ওগো, আমরা সবাই মরে গেছি, তাইনা?

নিলয়দা ঘ্যাঁচ করে ব্রেক কষতেই আমি বললাম, চুপ করে বসে থাকো, নিলয়দা, দেখো না কী হয়!

নিলয়দা বলল, হাটে অনেক মেয়ে, ও যদি কারুকে অ্যাটাক করে?

আমি আর কিছু বলবার আগেই ভোলানাথ জিপটার কাছে ফিরে এসে বলল, ওগো, আমরা সবাই মরে গেছি, তাই না? তোমরা গন্ধ পাচ্ছ না? সব মরা মানুষ!

আমি কঠোর ভাবে বললাম, ভোলানাথ, গাড়িতে উঠে এসো!

এই প্রথম ভোলানাথ আমার কথার সরাসরি উত্তর দিয়ে বলল, তুমি কে হে? ঠুটো জগন্নাথ? তোমার নাক নেই, চোখ নেই, কান নেই, তোমার কথা শুনব কেন?

এই সময় একটি মধ্যবয়সী আদিবাসী রমণী নিলয়দার পাশে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করল, ও বাবু, আন্ডা নেবে?

ভোলানাথ সেই মেয়েটির কাছে দৌড়ে আসবার আগেই আমি নেমে পড়ে তার পথ রোধ করে দাঁড়ালাম, সে তবু এগোবার চেষ্টা করতেই আমি লাগলাম তার বুকে এক ধাক্কা।

ভোলানাথ আমার তুলনায় অনেক বলশালী, সে যদি উলটে আমায় আক্রমণ করত তাহলে আমরা কী দশা হত কে জানে! কিন্তু ভোলানাথ সেরকম কিছু না করে কাঁদতে শুরু করে দিল। আমি তার কাঁধে হাত দিয়ে ঠাণ্ডাভাবে বললাম, ওঠো, গাড়িতে ওঠো! ভোলানাথ আর আপত্তি না করে সুড় সুড় করে উঠে এল।

বেলপাহাড়ি পৌঁছতেই সন্ধে হয়ে গেল আমাদের।

জঙ্গলের পথ আমি চিনি না। একবার ভাবলাম, এখানকার ডাকবাংলোতে রাতটা কাটিয়ে যাব কি না। পরের মুহর্তেই মনে হল, আজ রাত্তিরের মধ্যেই যা হোক কিছু হেস্তনেস্ত হয়ে যাওয়া ভাল।

নিলয়দা জিজ্ঞেস করল, রাস্তা ভুল হয়ে যাবেনা তো রে?

আমি বললাম, আস্তে আস্তে চালাও, আমাদের তো ভেতরের ফরেস্ট বাংলো পর্যন্ত যাবার দরকার নেই, একটা কোনও নিরিবিলি জায়গায় পৌঁছলেই হল।

অন্ধকার হয়ে এলেই জঙ্গলের চেহারা বদলে যায়। আকাশের আলো একেবারে মিলিয়ে যায়নি, কিন্তু জঙ্গলের মধ্যে রাস্তা দেখা যায় না। হেডলাইটের আলোয় মনে হয় আমরা একটা সুড়ঙ্গের মধ্য দিয়ে যাচ্ছি। এখন এ-রকম সুড়ঙ্গ সোজা একটাই, ডান দিকে, বাঁ-দিকে কিছু নেই। নানা রকম ঘরে-ফেরা পাখির ডাকে বেশ একটা ঐকতান শোনা যাচ্ছে। তারমধ্যে টিয়ার ডাকই অন্য পাখিদের ডাক ছাড়িয়ে যায়। এই বনে প্রত্যেক বারই অনেক টিয়া দেখেছি। দু'একটা পাখির ডাক চিনতে পারি না।

খানিকটা গেলেই একটা নদী পার হতে হবে মনে আছে। সেখানে রাস্তাটা অনেকখানি খাড়াই থেকে সোজা নদীতে নেমে যায়, ব্রিজ নেই, জলের ওপর দিয়েই পার হতে হয়। ওই জায়গাটা সাবধানে পার হতে হয়। আমি সামনের দিকে ভাল করে নজর রাখছি, কখন সেই নদীটা এসে পড়ে।

আচমকা পেছন থেকে আমার পিঠে এক কিল মেরে ভোলানাথ বলে উঠল, শোধ!

আমি এমন চমকে গিয়েছিলাম যে, হুমড়ি খেয়ে পড়ে যাচ্ছিলাম। আত্মরক্ষার জন্য আমি তাড়াতাড়ি পেছন ফিরে দু'হাত উঁচু করলাম।

ভোলানাথ হো-হো করে হেসে উঠল। নিলয়দাও হেসে ফেলে বলল, তুই যে ওর বুকে ধাক্কা মেরেছিলি, ও তার শোধ নিল!

আমি হাসতে পারলাম না। পেছন থেকে পিঠে কিল মেরে ঠাট্টা করতে পারে ঘনিষ্ঠ বন্ধুরা, ভোলানাথকে আমি এখন ঠিক বিশ্বাস করতে পারছি না, আবার মারবে না তো?

ভোলানাথ একটানা হেসে যাচ্ছিল, হঠাৎ হাসি বন্ধ করে বলল, বেশ ভাল জায়গা, খুব ভাল জায়গা, ঠাণ্ডা-ঠাণ্ডা!

নিলয়দা বলল, বাঃ, তোমার পছন্দ হয়েছে? আমরা এখানে থাকব।

ভোলানাথ বলল, কেউ থাকবে না, শুধু আমি থাকব। না না, আমিও থাকব না। শুধু জঙ্গলের মধ্যে জঙ্গল থাকবে। গাছের মধ্যে গাছ থাকবে। মাটির মধ্যে মাটি থাকবে। নিলয়দা আমার দিকে তাকাল। আমি কোনও মন্তব্য করলাম না।

নিলয়দা জিজ্ঞেস করল, কেন ভোলানাথ, তোমার এখানে থাকতে ইচ্ছে করছে না? এমন শান্ত জায়গা, কেউ এসে জ্বালাতন করবে না!

মাধুরী হারিয়ে গেছে, আমিও হারিয়ে গেছি। আর কেউ নেই। কে যে কখন হারিয়ে যায়, টেরও পায় না, হে-হে-হে!

হঠাৎ জিপটা গড়াতে লাগল নিচের দিকে। আমি আঁতকে উঠলাম, এই তো সেই নদীর খাদ। নিলয়দা যদি তক্ষুনি ব্রেক কষত তাহলে আমরা উলটে যেতাম নির্ঘাৎ, কিন্তু নিলয়দা স্টিয়ারিং শক্ত করে চেপে ধরে রইল অ্যাকসিলারেটর থেকে পা তুলে। আমরা হুড়মুড়িয়ে এসে পড়লাম নদীর জলে।

জল বেশি নয়, হাঁটুও ডুববে না, কিন্তু ছোট-বড় নানা রকম পাথর রয়েছে। চেনা ড্রাইভার এখান দিয়ে অবলীলাক্রমে নদী পার হয়ে যায় কিন্তু নিলয়দার হাতে ইঞ্জিন গোঁ গোঁ করতে লাগল, গাড়ি আর নড়েনা।

আমি বললাম, নেমে একটু ঠেলে দিচ্ছি। গাড়ি হালকা করা দরকার। নিজে নেমে দাঁড়িয়ে ভোলানাথকে হুকুম করলাম, নামো।

ভোলানাথ এ-সব কথা বোঝে। দিব্যি নেমে পড়ল টপ করে। আমি জিপটাকে ঠেলতে লাগলাম, কিন্তু ও হাত লাগাল না, জলের মধ্যে পা ছুঁড়ে ছুঁড়ে খেলা করতে লাগল।

খানিকটা ঠেলাঠেলির পর জিপটা গড়াতে শুরু করল, নদীর অন্য দিকের রাস্তাটা আরও বেশি খাড়াই। সেখান দিয়ে উঠতে নিলয়দা আর আমি গলদঘর্ম হয়ে গেলাম। ভোলানাথ নদীর জলে শুয়ে পড়ে গোটা গা ভিজিয়ে হা-হা-হা-হা করছে। ঠিক যেন একটা শিশু।

নিলয়দা ডাকল, ভোলানাথ, এসো, উঠে এসো!

জঙ্গলের নিস্তব্ধতা ভেঙে দিয়ে হা-হা করতে করতে ছুটে এল ভোলানাথ। দুপুরে ভরপেট খেয়েছে, ও বেশ মনের আনন্দেই আছে।

আর একটু এগোবার পর দুটো রাস্তা দেখতে পেলাম। একটা ডান দিকে, আর একটা সোজা। আমার যতদূর মনে পড়ছে, সোজ রাস্তাটা গেছে ফরেস্ট বাংলোর দিকে, বাংলোর কাছাকাছি একটা ছোট গ্রামে খুব জনবসতি আছে। সুতরাংও-দিকে যাবার কোনও মানে হয় না। আমি বললাম, চলো ডান দিকে।

এরপর শুরু হয়ে গেল পথের নানা শাখা-প্রশাখা। প্রায়ই ডান দিকে বা বাঁ-দিকে একটা করে রাস্তা বেরিয়ে গেছে, ছোট ছোট রাস্তা, কোনওক্রমে একটা গাড়ি যেতে পারে। আমি আন্দাজে একবার ডান দিকে, একবার বাঁ-দিকে বলে যেতে লাগলাম। দু পাশের গাছের ডালের ঝাপটা লাগতে লাগল গায়ে। কখনও হেডলাইটের আলোয় দেখা যাচ্ছে পথ জুড়ে রয়েছে একটা মাকড়সার জাল, মাঝখানে বসে আছে প্রায় টাকার সাইজের এক কালো মাকড়সা।

জঙ্গলের মধ্যে অচেনা রাস্তায় অন্ধকারের মধ্যে যাওয়ার একটা রোমাঞ্চ আছে। যদিও মনে মনে জানি, এই সব রাস্তা কোথাও না কোথাও পৌঁছে দেবে ঠিকই, তবু মনে হয় যেন দিক ভুলে আমরা নিরুদ্দেশ যাচ্ছি। সবসমুদ্রেরই তল আছে, তবু যেমন সমুদ্রের ওপর ভাসতে ভাসতে অতল কথাটা মনে পড়ে।

এখন জঙ্গলে আমাদের গাড়ির শব্দ ছাড়া কোনও শব্দ নেই, কোথাও প্রাণের চিহ্ন নেই। বড় বড় গাছগুলো যেন আমাদের ওপর ঝুঁকে আসছে।

নিলয়দা বলল, এ কোথায় এলাম রে, নীলু? হঠাৎ হাতির পাল সামনে এসে যায়, কী করব? গাড়ি ফেরাবার তো জায়গা নেই।

আমি বললাম, গাড়ির স্টার্ট বন্ধ করে বসে থাকবে, হাতিরা কিচ্ছু বলবে না, আমার আগে এরকম অভিজ্ঞতা আছে।

আর কত দূরে যাব?

রাস্তাটা আবার ঢালু হয়ে এসেছে, দূরে চিক চিক করছে জল। সেই পর্যন্ত এসে আমি বললাম, এখানেই থামা যাক।

নদী নয়, এখানে রয়েছে একটা সরু ঝরনা, কিন্তু স্রোতের তেজ আছে। দু'পাশে অনেকখানি কাঁকা। বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন জায়গা। খানিকটা জ্যোৎস্না এসে পড়েছে সেখানে। নিলয়দা জিপটা ঘুরিয়ে রেখে হেডলাইট নিভিয়ে দিতেই চাঁদের আলোয় সেই ঝরনা তীরবর্তী স্থানটি বড় মোহময় দেল।

নিলয়দা নেমে এসে বলল, পিকনিকের পক্ষে চমৎকার জায়গা। এলো ভোলানাথ, তোমার খিদে পায়নি?

ভোলানাথ জিপে বসেই গুন গুনকরে সুর ভাঁজছে। আমি বাঁদরকে কলার লোভ দেখাবার মতন একটা সিগারেটের প্যাকেট বার করে বললাম, সিগারেট খাবে? এসো, এসো।

সিগারেটের লোভেই ভোলানাথ নেমে এল। আমি ওকে নিয়ে চলে এলুম ঝরনার কাছে। জ্যোৎস্নায় রুপোলি দেখাচ্ছে ঝরনাটাকে। যেন বনবিবি তার ওড়নাটা ফেলে গেছে এখানে। আরও মনে হয়, একটু আগেই হরিণেরা জল পান করতে এসেছিল, আমাদের শব্দ পেয়ে চলে গেছে।

ঝরনার ধার দিয়ে দিয়ে আমরা দুজনে হাঁটতে লাগলাম ঢালুর দিকে। ফাঁকা জায়গাটা শেষ হয়ে আবার বড় বড় গাছ শুরু হলো, সেখানেই একটা গাছের তলায় আমি বসে পড়লাম। কেন যেন আমার বুকের মধ্যে ঢিপঢিপ শব্দ হচ্ছে।

ভোলানাথ ঝরনার জলে পা ডুবিয়ে বলল, ঠাণ্ডা! খুব ঠাণ্ডা জল, একেবারে পোকা পেঁপের মতো।

ভোলানাথের উপমা শুনে আমি বিস্মিত হলাম। এ-রকম তাকে আগে বলতে শুনিনি। এমন যদি হত, আমরা তিন বন্ধু জঙ্গলের মধ্যে রাত্তির বেলা পিকনিক করতে এসেছি, তাহলে ব্যাপারটা কত আনন্দের হত। কিন্তু সে-রকম আর হবার নয়।

নিলয়দা দু' বগলে দুটো বেশ বড় পলিথিনের থলে বয়ে নিয়ে এল।

আমি হতবাক। নিলয়দা এসবকী এনেছে, এগুলো রেখেছিল কোথায়? নিশ্চয়ই সিটের নিচে।

নিলয়দা লাজুক ভাবে বলল, একটাতে আছে চিড়ে, আর এটাতে কাঁচা বাদাম। কয়েক দিন চলবে। প্রথম প্রথম খাবার খুঁজতে যেতে তো ইচ্ছে হবে না।

প্যান্টের দু'পকেট থেকে পাঁচ-ছ'প্যাকেট সিগারেট আর গোটা চারেক দেশলাই বার করে রাখল নিলয়দা। তারপর বলল, নীলু, তুই চায়ের ফ্লাস্ক আর বিস্কুটের টিনটা নিয়ে আয়।

আমাদের জিপটা বেশ ওপরে। আসলে একটা টিলার গা দিয়ে নেমে এসেছে ঝরনাটা। আমি দ্রুত এসে জিপটায় চড়ে একটুখানি বসে রইলাম। ভোলানাথের সঙ্গে নিলয়দার কিছু কথা থাকতে পারে, যা হয়তো আমার সঙ্গে বলতে লজ্জা পাবে। তাছাড়া আমার খানিকটা সময় কাটানো দরকার। পুরো একটা সিগারেট শেষ করার পর আমি চায়ের ফ্লাস্ক ও বিস্কুটের টিন নিয়ে রওনা দিলাম ধীরে ধীরে। একটুখানি গিয়ে মনে পড়ল প্লাস্টিকের গেলাস তিনটে আনা হয়নি। আবার ফিরে এসে নিয়ে গেলাম সেগুলো।

ঝরনাটাকে খুব পছন্দ হয়েছে ভোলানাথের। সে সেখানেই পা ডুবিয়ে বসেছে একটা পাথরের ওপর। আমি গেলাসে চা ঢেলে দিলাম ওকে। ভোলানাথ বিড় বিড় করে বলল, মাধুরী নেই, আমি নেই, নেই নেই।

আমি বললাম, বিস্কুট আছে। খাও!

বিস্কুটের টিনটা ওর পাশেই বসিয়ে দিলাম, ও একটার পর একটা খেয়ে যেতে লাগল। বুঝলাম যে, শেষ না হলে ও থাকবে না।

নিলয়দা আমায় জিজ্ঞেস করল, নীলু, গাড়িতে টর্চ আছে, আনিসনি?

আমি বললাম, এই রে ভুলে গেছি। তুমি একটু নিয়ে আসবে? টর্চ নিয়ে আমরা জঙ্গলের ভেতরটা একটু ঢুকে দেখতাম।

নিলয়দা উঠে দাঁড়িয়ে দু'পা গিয়ে থমকে দাঁড়াল। কম্পিত গলায় বলল, ভোলানাথ, তুমি থাকো, আমি আসছি।

ভোলানাথ একমনে বিস্কুট খেয়ে যেতে লাগল, নিলয়দার দিকে ফিরেও তাকাল না।

নিলয়দা আবার ডাকল, ভোলানাথ।

এবারেও ভোলানাথ গ্রাহ্য করল না তার ডাক। আমি তাড়া দিয়ে বললাম, যাও, টর্চটা নিয়ে এসে নিলয়দা!

এবার নিলয়দা চলে গেল জিপটার দিকে। আমি ঝরনার জলে গেলাসগুলো ধুয়ে ফেললাম। ফ্লাস্কে আর চা নেই, সেটাও ধোওয়া হল। দূরে তাকিয়ে দেখলাম, নিলয়দা অন্ধকারের মধ্যে মিলিয়ে গেছে। ঝরনার জলের চাপা কুলুকুলুশব্দ আর ভোলানাথের বিস্কুট চিবোনোর শব্দ। আকাশের অল্প অল্প মেঘ আছে। সেই জন্য মাঝে মাঝে জ্যোৎস্না মুছে যাচ্ছে। প্রতিটি মুহূর্তকে আমার মনে হচ্ছে অনন্তকাল।

এক সময় জিপ থেকে নিলয়দার গলা শুনতে পেলাম, কই রে নীলু, টর্চটা খুঁজে পাচ্ছি না। কোথায় রেখেছিস?

আমি চেঁচিয়ে বললাম, দেখো, বাঁ-দিকে গ্লাভ কম্পার্টমেন্টে।

কই, সেখানে খুঁজে পাচ্ছি না তো?

আমি আসছি, দেখিয়ে দিচ্ছি।

ফ্লাস্কটা তুলে নিয়ে আমি বললাম, ভোলানাথ, বিস্কুট খাও, আমি টর্চটা খুঁজে দিয়ে আসছি।

ভোলানাথ বলল, আমিও থাকবনা, তুমিও থাকবে না, কেউ থাকবে না।

আমি হন হন করে হেঁটে গেলাম টিলাটার দিকে। শেষের দিকে দৌড় দিয়ে এক লাফে এসে বসলাম জিপে। হাঁপাতে হাঁপাতে বললাম, চালাও! জিপটা ঘুরিয়েই রাখা ছিল। নিলয়দা সঙ্গে সঙ্গে স্টার্ট দিয়েই স্পিড তুলল। আমি মাথাটা বাইরে ঝুঁকিয়ে শোনবার ও দেখবার চেষ্টা করলাম কেউ চ্যাঁচাচ্ছে কিংবা ছুটে আসছে কিনা! না, সেরকম কিছুই হল না!

আমাদের পরিকল্পনা একেবারে নিখুঁত ভাবে কাজে লাগানো হয়েছে। প্রতিটি সংলাপও আগে থেকে মুখস্থ করা। ঠিকই ছিল যে, শেষ গন্তব্যে পৌঁছে আমরা ভোলানাথের সঙ্গে পাঁচ মিনিটের বেশি সময় কাটাবনা, শুধু একটুখানি চা খাব। বেশিক্ষণ থাকলেই মায়া কাটানো মুশকিল।

হয়তো এত নিখুঁত পরিকল্পনার দরকারই ছিল না, আমরা যা কবেছি, সেভাবে কোন সুস্থ মানুষকেও ঠকানো যেত। ভোলানাথের এত কিছু বোঝার ক্ষমতাই নেই। কিংবা যদি বুঝতে পেরে থাকে, তাতেই-বা কী করা যাবে!

ডান দিকে বাঁ-দিকে যে-কোনও রাস্তা পেলেই তা দিয়ে চলে যাচ্ছে নিলয়দা। এর মধ্যে আমরা অনেকটা দূরে চলে এসেছি। এখন ইচ্ছে করলেও আর চট করে রাস্তা খুঁজে ভোলানাথের কাছে ফিরে যাওয়া যাবেনা।

একটা বাঁকের মুখে এসে জোরে ঘোরাতে যেতেই স্টার্ট বন্ধ হয়ে গেল। আর সঙ্গে সঙ্গে স্টিয়ারিং এর ওপর মাথা দিয়ে হু হু করে কেঁদে উঠল নিলয়দা।

আমি চুপ করে বসে রইলাম। এখন কোনও কথারই মূল্য নেই। কান্নাটা আমাদের পরিকল্পনার মধ্যে ছিল না। নিলয়দা কাঁদছে অথচ আমার কান্না পাচ্ছে না কেন? নিলয়দার চেয়ে আমার হৃদয় কি কঠোর! মূল পরিকল্পনাটা তো নিলয়দারই। কাল সন্ধেবেলা নিলয়দা বলেছিল, গঙ্গার ধারে ছেড়ে দেওয়ার চেয়ে দূরে কোনও জঙ্গলে ভোলানাথকে রেখে আসা অনেক ভাল। তাতে ও বাঁচার একটা সুযোগ পাবে, আমাদেরও বিবেক পরিষ্কার থাকবে। যে-মানুষকে সমাজ নেয় না, জঙ্গলই তো তার উপযুক্ত জায়গা।

নিলয়দা বেশ কেঁদে কেঁদে বুক খালি করে নিচ্ছে, নিলয়দাকে এখন হিংসে হচ্ছে আমার। আমি দারুণ পরিশ্রান্ত বোধ করছি, এক্ষুনি ইচ্ছে করছে চিত হয়ে শুয়ে পড়তে। কিন্তু আগে যে-কোনও উপায়ে এই জঙ্গল থেকে বেরিয়ে যাওয়া দরকার।

মিনিট পাঁচেক বাদে নিলয়দার পিঠে হাত রেখে আস্তে আস্তে বললাম, এবারে চলো।

মুখ তুলে নিলয়দা আকুল ভাবে বলল, কী করলাম রে নীলু! এ কী করলাম। এক জন মানুষকে এভাবে ফেলে যাওয়া যায়? আমি যখন শেষ বিদায় নিলাম, তখন ও অভিমান করে আমার সঙ্গে একটা কথাও বলল না! চল, ফিরে যাই।

আমি বললাম, নিলয়দা, তুমি প্রতিজ্ঞা করেছিলে। কাল বলেছিলে, কিছুতেই এ প্রতিজ্ঞার নড়চড় হবে না। রূপাবউদির কথা ভাবো, পাপুনের কথা ভাবো।

নিলয়দা স্টিয়ারিঙের ওপর একটা কিল মেরে বলল, ধুত্তোরি তোর সংসারের নিকুচি করেছে। পরের মুহূর্তেই সামলে নিয়ে শান্তভাবে বলল, নাঃ! বাড়ি ফিরতে হবে।

আবার জিপটা চলতে শুরু করল। বেশ কিছুক্ষণ আমরা কেউ কোনও কথা বললাম না। কোন দিকে যে যাচ্ছি, তা কিছুই জানি না। এখন আর রাস্তা চেনা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। জঙ্গলটা যেন এখন একটা গোলোকধাঁধা। এর মধ্যে যদি সারা রাত আমাদের ঘুরে বেড়াতে হয়? জঙ্গলের মধ্যে অচেনা রাস্তা, হঠাৎ কোথাও আমরা খাদে পড়ে যেতে পারি, কোনও জায়গায় রাস্তা ভাঙা থাকতে পারে। এই রাস্তায় সপ্তাহে একটা দুটো গাড়ি যায়, তা-ও রাত্তিরবেলা কেউ যায় না। থাক গে, যা হয় হোক।

আধ ঘণ্টার বেশি গাড়িটা বিভিন্ন বাঁকে ঘোরবার পর নিলয়দা জিজ্ঞেস করল, সেই নদীটা কোথায় রে নীলু? মনে হচ্ছে, বার বার যেন একই রাস্তায় ফিরে আসছে।

আমি নিষ্প্রাণ ভাবে বললাম, আমিও কিছু বুঝতে পারছি না, নিলয়দা।

নদীটা পার না হলে ফেরার রাস্তা পাব কী করে?

একটা রাস্তা ঘাটশিলার দিকে চলে গেছে আমি জানি, সেটা পেলেও তো হত।

এক কাজ কর, পেছনের সিটের তলায় আমি দেখেছি কয়েকটা পুরোনো খবরের কাগজ আছে, সেগুলো বার কর। এরপর কোনও মোড় ঘুরলেই সেখানে কয়েকটা কাগজ ছড়িয়ে দিবি। তারপর যদি সেখানে আবার ফিরে আসি, তাহলে কাগজগুলো দেখে বুঝতে পারব।

দুটো মোড়ে আমি এ-রকম খবরের কাগজ ছড়িয়ে দিলাম। তারপর তৃতীয় মোড়টায় বাঁক নিতেই একটা দৃশ্য দেখে আঁতকে উঠলাম দুজনেই। রাস্তাটা সোজা চলে গেছে। দুতিনশো গজ দূরে রাস্তার মাঝখান দাঁড়িয়ে আছে এক জন মানুষ। কিংবা দাঁড়িয়ে নেই, দুহাত তুলে ছুটে আসছে আমাদেরই দিকে। যে আসছে, সে আর্ত কেউ নয়, যেন এক মূর্তিমান প্রতিশোধ।

ও কে? ভোলানাথ? জঙ্গলের কোনও আদিবাসী, অথবা কোনও প্রেতাত্মা? অথবা আমাদের

আমি যেন পাগল হয়ে গেলাম সেই মুহূর্তে। খ্যাপাটে গলায় চেঁচিয়ে উঠলাম, নিলয়দা, জিপ ঘোরাও! ব্যাক করো। ও যেন আমাদের ধরতে না পারে। ও ধরতে পারলে আমাদের মেরে ফেলবে। শিগগির, নিলয়দা শিগগির!

আমার সেই উত্তেজনা নিলয়দার মধ্যেও সঞ্চারিত হয়ে গেল। দারুণ ঝুঁকি নিয়ে নিলয়দা জিপটা চালিয়ে দিল ব্যাক গিয়ারে। একটা মোড় পেয়ে সেই দিকে বেঁকে গিয়ে জোর স্পিড তুলে দিল, তারপর আর একটা মোড় ঘুরতেই আমাদের গাড়ি গড়িয়ে পড়ে গেল নদীতে।

.

১০.

কলকাতায় ফেরার দু চার দিন পরেই নানা লোকের মুখ থেকে চাপা ভৎর্সনা শুনতে লাগলাম আমি আর নিলয়দা। কী করে যে লোকে সব কথা জেনে যায়। অনেকেরই ধারণা, যেমন ভাবে অবাঞ্ছিত বিড়াল বা কুকুরকে পার করে দেওয়া হয়, সেই রকম ভাবেই আমি আর নিলয়দা এক জন পাগলকে বাইরে কোথাও ছেড়ে দিয়ে এসেছি। জঙ্গলে বা কোথায় রেখে এসেছি তা অবশ্য কেউ স্পষ্ট করে বলতে পারে না। আমরা এত গোপনীয়তা নেওয়া সত্ত্বেও এই গল্প ছড়াল কী করে? স্বর্ণ বলেছে? জিপগাড়ির মালিক?

আমরা ধারণা সাত্যকি বসুমল্লিকেরই অপকীর্তি এটা। কিন্তু বাহারাগোড়ার মোড়ে সাত্যকি বসুমল্লিক কি আমাদের দেখতে পেয়েছিল? দেখলেও জানবে কী করে, কে কে ছিল আমাদের জীপে। সাত্যকি বসুমল্লিক তার গাড়ি থামায়নি, একবার ভ্রূক্ষেপও করেনি। তাহলেও হয়তো সাত্যকি বসুমল্লিকের স্পাই আছে চতুর্দিকে ছড়ানো।

ফিরে আসার দুদিন পরেই একজন পুলিশ অফিসার এসেছিলেন নিলয়দার বাড়িতে। কোন এক ডিআইজি তাকে পাঠিয়েছেন, একজন রাস্তার পাগলকে নাকি জেলে রাখার ব্যাপার আছে, অফিসারটি সেই পাগলকে অ্যারেস্ট করতে এসেছেন। নিলয়দা তাকে জানাল যে, তার আর দরকার নেই, পাগলটি সেখানে আর থাকে না। অফিসারটি যেন সেকথা শুনে নিশ্চিন্ত নিশ্বাস ফেলে বলেছিলেন, তবে তো আপদ চুকেই গেছে! ডিআইজি যদি খোঁজ করেন তো বলে দেবেন যে আমি এককোয়ারিতে এসেছিলাম।

কফি হাউসে আমার এক বন্ধুর এক বন্ধু অপ্রতিম আমাকে বলল, তোরা এটা কী করলি, নীলু? এক জন মানুষের দায়িত্ব নিয়েও পিছিয়ে গেলি? তাহলে প্রথমে সেই লোকটিকে রাস্তা থেকে কুড়িয়ে নিয়ে যেতে কে বলেছিল তোদের।

আমি বললাম, রাস্তার ছেলেরা এক জন মানুষকে পিটিয়ে মেরে ফেলছিল, তাকে সেই অবস্থা থেকে বাঁচানো অন্যায়? চোর-ডাকাত-ছেলেধরা সন্দেহ করে প্রায় প্রতিদিনই তো একটা দুটো লোককে ক্রুদ্ধ জনতা খুন করছে। যারা মরছে, তারা সত্যি সত্যি অপরাধী কি না, তা বিচার করে দেখার নেই। কিংবা ওদের থেকেও অনেক বড় বড় অপরাধীরা সসম্মানে ঘুরে বেড়ায়, সে-সম্পর্কে তোমরা নির্বিকার। এইসব বর্বরতার বিরুদ্ধে কোনও প্রতিবাদ করো না। হঠাৎ এই এক জন পাগলকে নিয়ে তোমার এত মাথাব্যথা কেন?

অপ্রতিম এমন একটা উদার হাসি দিল, যেন আমার মতো একজন নির্বোধের সঙ্গে সে দয়া করে কথা বলছে। চওড়া হাসিটা ঠোঁটে এঁকে রেখে সে বলল, সে তো মব ভায়োলেন্সের ব্যাপার। একটা দেশে এইরকম ভায়োলেন্স কেন শুরু হয়। সেই কারণটার গভীরে যাওয়া দরকার। পুরো ব্যবস্থাটাই না পালটালে যে এই সব জিনিস বাড়তেই থাকবে, এটা যে বোঝে না, তার সঙ্গে এসব বিষয়ে আলোচনাই করা যায় না।

আমি উঠে পড়তে যাচ্ছিলাম, অপ্রতিম তবু ডেকে বলল, লোকটাকে কুকুর-বেড়ালের মতো খেদিয়ে দেওয়ার আগে একবার আমায় বললেই পারতিস। বহরমপুরে একটা ভ্যাগরান্সি হোমে আমার চেনা একজন কাজ করে। সেখানে ভর্তি করে দিতুম।

আমি বললাম, রাস্তায় তো এখনও আরও অনেক পাগল ঘুরে বেড়ায়, তাদের জন্য কিছু করো না!

সত্যি, এখন যেন পথে-ঘাটে আমি অনেক বেশি পাগল দেখতে পাই। আগে এদের লক্ষ করতাম না। হাওড়া স্টেশনে, রাইটার্স বিল্ডিংসের দক্ষিণ কোণে, বিড়লা প্ল্যানেটারিয়ামের পাশে যখন তখন এক জন পাগল বা পাগলিকে বসে থাকতে দেখি। আমাদের বাজারের সামনের সেই পাগলীকে অবশ্য কয়েকদিন আর দেখিনি। তবে পনেরোই আগস্ট তাকেই কিংবা তারই মতো আর একজনকে দেখলাম পার্ক স্ট্রিটে ঠিক রাত ন'টা পঁচিশমিনিটে। একটা সিনেমা দেখে ফিরছিলাম, দাদা-বউদিসঙ্গে ছিল বলে ট্যাক্সি নেওয়া হয়েছিল। পনেরোই আগস্টেও লোডশেডিং, অন্ধকারের মধ্যে গাড়ির আলোয় চোখে পড়ল এক নগ্ন নারী মূর্তি, অদ্ভুত ভাবে বেঁকে দাঁড়িয়ে সে যেন পৃথিবী ও আকাশকে অবজ্ঞা করছে। এর পরনে একটা গামছা পর্যন্ত নেই। এক মুহূর্তের জন্য মনে হল, এ বছর স্বাধীনতা দিবসে এই কি ভারতমাতার মূর্তির প্রতিষ্ঠা হল?

ট্যাক্সিটা এগিয়ে যাবার পর দেখলাম পরের মোড়ের মাথায় দু' জন কনস্টেবল দাঁড়িয়ে গল্প করছে ছুটির দিনের মেজাজে। আমি ট্যাক্সিটা থামতে বলে নেমে গেলাম। সেই দু'জনের কাছে গিয়ে বললাম, দেখিয়ে, উধার এক পাগলি জেনানা খাড়ে হুয়ে হ্যায়, একদম নাঙ্গা।

সেপাই দু'জন গল্প থামিয়ে অতিশয় অবাক হয়ে তাকাল আমার দিকে। একজন বলল, হামলোগ কেয়া করে গা?

আমি বললাম, পার্ক স্ট্রিটমে কিতনা গাড়িচলতা, বাহার সে সাহেব লোগ আতা, হিয়া পর এক নাঙ্গা জেনানা–

অধিকতর অভিজ্ঞ সেপাইটি ডান হাতের পাঞ্জা নাড়িয়ে মাছি তাড়াবার ভঙ্গিতে বলল, যাইয়ে, যাইয়ে, আপ ঘর যাইয়ে।

আমি আবার ফিরে এলাম ট্যাক্সিতে। দাদা আমার বেশির ভাগ কীর্তি কাহিনিই জানে না। হঠাৎ ট্যাক্সি থামিয়ে নেমে গেছি বলে কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞেস করল, কী ব্যাপার? কোথায় গিয়েছিলি?

আমি বললাম, একটু আগে যে পাগলিটাকে দেখলে না, আমি এখানে দু'জন পুলিশকে দেখে বলতে গিয়েছিলাম যাতে ওরা কিছু ব্যবস্থা করে!

বউদি বললো, ছি ছি ছি, দেখলে এমন বিচ্ছিরি লাগেনা!

দাদা বলল, কেন যে এদের কলকাতা থেকে বার করে দেয় না। পুলিশও হয়েছে এমন। তুই আবার এসব নিয়ে মাথা ঘামাতে যাস কেন? কেউ কিছু বলতে গেলে তাকেই ঝঞ্ঝাটে পড়তে হয়।

তখন আমার মনে হল, নিলয়দা রাস্তা থেকে ভোলানাথকে তুলে না নিয়ে যদি কোনও পাগলীকে নিয়ে যেত, তাহলে নিশ্চয়ই তার সতেরো রকম ব্যাখ্যা হত!

স্বর্ণর সঙ্গে জয়ের ভাব হয়ে গেছে এর মধ্যে। এখন স্বর্ণ আমার দিকে অদ্ভুত তির্যক ভাবে তাকায়। প্রথম দিন স্বর্ণ আমাকে নানাভাবে জেরা করে জানতে চেয়েছিল, ভোলানাথকে আমরা সত্যিই পুরুলিয়ার হাসপাতালে ভর্তি করে দিয়ে এসেছি কি না! আমার সাক্ষ্য বোধহয় খুব একটা বিশ্বাসযোগ্য হয়নি। স্বর্ণর ধারণা যে, নিলয়দা আর আমি ভোলানাথকে খুন করে কোথাও ফেলে দিয়ে এসে সমস্যার সমাধান করেছি। বাইরে নিয়ে গিয়ে হয় ওকে পাহাড়ের ওপর থেকে আচমকা নিচে ঠেলে ফেলে দিয়েছি, অথবা বিষ খাইয়ে কোনও নদীতে ভাসিয়ে দিয়েছি। বলাই বাহুল্য, আসল খুনি আমিই, নিলয়দা এই সমাধানটা মেনে নিয়েছে মাত্র। খুনি মানেই ঘৃণ্য। জনতা যখন একজন মানুষকে পিটিয়ে মারে, তখন ব্যক্তিগত ভাবে কারুর হাতে পাপ লাগেনা। কিন্তু আমি পাপী। আমি যদি স্বর্ণকে মনে করিয়ে দিই যে, সে নিজেই একদিন তার দাদার সার্ভিস রিভলবার দিয়ে ভোলানাথকে খুন করতে চেয়েছিল, তাহলে নির্ঘাৎ স্বর্ণ হেসে বলবে, সে তো কথার কথা!

রূপাবউদি অবশ্য ব্যাপারটাকে এভাবে নেয়নি। রূপাবউদিকে নিলয়দা সব কথা খুলে বলেছে। রূপাবউদির ধারণা, নিলয়দা মিথ্যে কথা বলতে অপারগ, সুতরাং সে বিশ্বাস করেছে নিলয়দার সব কথা। একদিন রূপাবউদি আমাকে হাসতে হাসতে বলল, জানো নীলু, তোমাদের ওই ভোলানাথের পর্বটি বোধহয় এখনো শেষ হয়নি, আবার সে উপদ্রব করবে, আবার তার সঙ্গে তোমাদের দেখা হবে। জঙ্গলের মধ্যে পাথর দিয়ে ঠুকে ঠুকে ওর মাথাটা একেবারে গুড়ো করে দিয়ে এলে না কেন? আমি যদি থাকতাম তো তাই দিতাম। মেয়েদের যে অপমান করে, মেয়েদের যে সহ্য করতে পারে না, এই পৃথিবীতে তার বেঁচে থাকার কোনও অধিকার নেই।

রূপাবউদি যে-দিন এই কথাগুলো বলল, সেই রাতেই আমি একটা স্বপ্ন দেখলাম। এই স্বপ্নে রূপাবউদি নেই, নিলয়দা নেই, ভোলানাথও নেই। শুধু সাত্যকি বসুমল্লিক আর আমি। সাত্যকি বসুমল্লিক একটা সাদা রঙের ডিজেল জিপ চালিয়ে চলেছে, পাশে বসে আছি আমি। আমার হাত-পা দড়ি দিয়ে বাঁধা। সাত্যকি বসুমল্লিক মাঝে মাঝে আমার দিকে আড়চোখে তাকিয়ে রহস্যময় ভাবে হাসছে। অন্ধকারে একটা গভীর জঙ্গলে ঢোকার পর এক জায়গায় সে গাড়ি থামিয়ে একটা লাথি মেরে আমাকে ফেলে দিল নিচে। তারপর গাড়িটা ঘুরিয়ে সে যখন আমার কাছে এল, তখন তার হাতে একটা বড় পাথর। উদার, অমায়িক ভাবে সে বলল, কেন তোমাকে আমি খুঁজছিলাম জানো? কেন বলেছিলাম তোমার মতো এক জনকেই আমার খুব দরকার? এই জন্য। তুমি জেনে ফেলেছিলে আমি একটা গুপ্ত পাগল, সে কথা তুমি সবাইকে জানিয়ে দিতে চেয়েছিলে, হাঃ হাঃ হাঃ! এখন এই পাথর দিয়ে ঠুকে ঠুকে তোমাকে শেষ করব। তোমার মাথার ঘিলু বেরিয়ে পড়বে, পিঁপড়ে আর পোকা মাকড়রা এসে চেটে চেটে খাবে, আমি তাই দেখব! মানুষের মাথার ঘিলু বার করে দিতে আমার খুব ভাল লাগে!

এই বীভৎস স্বপ্ন দেখে আমি জেগে উঠলাম মাঝরাত্রে। দুঃস্বপ্নটা এমনই বিশ্বাসযোগ্য যে আমি ধড়মড় করে উঠে বসে আমার মাথায় হাত দিয়ে দেখলাম, সত্যিই আমার ঘিলু

গড়িয়ে পড়ছে কিনা। সাত্যকি বসুমল্লিক যে মিষ্টি হেসে বলেছিল, আপনার মতো একটি ছেলেকেই আমার দরকার, তার মানে সে আমার মস্তিষ্ক বার করে নিতে চায়।

একটু বাদে আমি বিলক্ষণ চটে গেলাম। কেন আমি দেখলাম এ-রকম দুঃস্বপ্ন? অবচেতন নামে সিগমুণ্ড ফ্রয়েডের একটা নিজস্ব তালুক আছে। সেখানে বসে বসে সেই দাড়িওয়ালা বুড়ো আমাকে নিয়ে ইঁদুর-বেড়াল খেলাতে চায়? এর উলটো স্বপ্নই তো আমার দেখা উচিত ছিল। আমি গাড়ি চালাব। সাত্যকি বসুমল্লিক হাত-পা বাঁধা অবস্থায় পাশে পড়ে থাকবে। জঙ্গলের মধ্যে আমি এক সময় তাকে লাথি মেরে ফেলে দেব, তারপর একটা বড় পাথর নিয়ে– ।

চোখ বুজে আমি এই দ্বিতীয় স্বপ্নটা দেখার চেষ্টা করলুম। কিন্তু কিছুতেই জমল না। যখনই চোখ খুলি, বুঝতে পারি আমি জেগে আছি, বায়ুর ঊর্ধ্বচাপে আমি কল্পনার ওপর জোর খাটাবার চেষ্টা করছি মাত্র। মাঝে মাঝে কফি হাউসের সেই অপ্রতিম এসে ফ্যাক ফ্যাক করে হাসছে আর বলছে, হয় গাঢ় স্বপ্নে অথবা কঠোর বাস্তবে সাত্যকি বসুমল্লিকের মুখোমুখি হতে হবে, বুঝলে নীলু, নিছক ইচ্ছাপূরণ কল্পনায় কোনওই কাজের কাজ হয় না!

বড় অসুখী অবস্থায় আমার সেই রাতটা কাটাল।

লোকে যাই বলুক, আমার ধারণা ভোলানাথ বেশ ভালই আছে। সাধুরা বলে, কামিনী কাঞ্চন পুরোপুরি ত্যাগ করতে পেরেছে। লোকে ভোলানাথকে পাগল ভাবে, আসলে সে হয়তো রয়েছে ভাবের ঘোরে। ভোলানাথ মাঝে মাঝে যে-সব কথা বলে, অনায়াসেই সেগুলোকে গভীর তত্ত্ব বলে চালিয়ে দেওয়া যায়। ভোলানাথের সে-রকম কয়েক জন ভক্ত থাকলে এই সব বাণীই প্রচার করে, প্রচুর চ্যালা জুটিয়ে ফেলতে পারত। সাহেব মেমরা এসে তার পায়ে পড়ে কাঁদত। রবীন্দ্রনাথ যে লিখেছিলেন, তোমার এই মাধুরী ছাপিয়ে আকাশঝরবে, ভোলানাথ কি সেই মাধুরীর কথা বলে? সেই মাধুরী হারিয়ে গেছে? এ তো বেশ নতুন রকমের চিন্তা। আমি বিদায় নেবার সময় ভোলানাথ ঝরনার জলে পা

ডুবিয়ে রেখে খুব সহজভাবে বলেছিল, আমিও থাকবনা, তুমিও থাকবেনা। কেউ থাকবেনা। বেদ-উপনিষদেও তো এই টাইপের কথাই থাকে।

কল্পনায় দেখতে পাই, সেই ঝরনাটার পাশে শুয়ে আছে ভোলানাথ, আকাশের দিকে চেয়ে চেয়ে সিগারেট টানছে। তার অতীত নেই, তার ভবিষ্যতের চিন্তা নেই। হয়তো সেই পলিথিনের ব্যাগভর্তি চিড়ে আর বাদাম এরমধ্যেই ফুরিয়ে গেছে, কিন্তু তার শরীরে রয়েছে অতি স্বাস্থ্যকর খিদে, যে-কোনও খাবার পেলেই তার শরীর সন্তুষ্ট হবে। গাছের পাতাই বা মন্দ কী। আমি ছেলেবেলায় তেঁতুল গাছের কচি কচি পাতা চিবিয়ে চিবিয়ে খেতুম, টক টক, বেশ সুন্দর খেতে।

যখনই কেউ অপমান করে, প্রয়োজনের জন্য কোথাও গিয়ে যখন ব্যর্থ হই, তখনই মনে হয়, ভোলানাথকে তো এসব কিছুই সহ্য করতে হয় না। ওর বদলে আমিই তো জঙ্গলে গেলে পারতাম। কিছুক্ষণ জঙ্গলের স্বপ্ন দেখতে দেখতে অবশ্য বুঝতে পারি, ভোলানাথের তুলনায় আমি অনেকটাই অযোগ্য। কাঞ্চন সম্পর্কে আমার আসক্তি নেই, কিন্তু কল্পনাতেও তো কামিনীদের ত্যাগ করতে পারি না। বিজন অরণ্যে এক ঝরনার পাশে আমি যখন নিজেকে শুইয়ে রাখি, তখন ঝরনার অন্য পারে আরও এক জন কেউ শুয়ে থাকে, তাকে ঠিক চিনতে পারি না, সে যেন অভিমানে ফিরিয়ে আছে মুখ, তার চুলের ওপর ঝরে পড়ছে ফুলের রেণু।

আমাদের সেই অভিযানের ঠিক সতেরো দিন পর আর একটা ঘটনা ঘটল। পাপুনের জন্মদিন উপলক্ষে রূপাবউদি নেমন্তন্ন করেছে আমাকে। বেশি লোকজন নয়, নিজেদের মধ্যেই ব্যাপার, পাপুনের কিছু স্কুলের বন্ধু আর আমরা কয়েক জন। সন্ধেবেলা কেক-টেক কাটা হল, পাপুনের বন্ধুরা খেয়ে দেয়ে চলে গেল বাড়িতে, পাপুনও ঘুমিয়ে পড়ল, স্বর্ণ আর জয় এখন এসে পৌঁছোয়নি বলে আমরা অপেক্ষা করছি। ওরা একটা থিয়েটার দেখে আসবে। বসবার ঘরে বসে আড্ডা দিচ্ছি নিলয়দা, রূপাবউদি আর আমি। রূপাবউদির আজ মেজাজ খুব ভাল, ওর অফিসের এক জন সহকর্মীকে নিয়ে দারুণ

মজার গল্প বলছিল, এই সময় কলিং বেল বেজে উঠল। স্বর্ণরা এসেছে ভেবে রূপাবৌদি চেঁচিয়ে বলল -জীবন, দরজাটা খুলে দে।

রান্নার ঠাকুর এসে বলল, একজন ভদ্রমহিলা দাদাবাবুকে ডাকছেন।

নিলয়দা অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, কে?

জীবন বলল, চিনি না! সঙ্গে একটি আট-দশ বছরের ছেলে রয়েছে।

রাত সাড়ে ন'টা বাজে, এখন কোন অচেনা মহিলা এসেছে দেখা করতে?

নিলয়দা উঠতে যাচ্ছিল, রূপাবউদি জীবনকে বলল, এখানে ডেকে নিয়ে আয়।

মহিলাটিকে দেখেই আমার মনে পড়ে গেল ভোলানাথের কথা। আমার এ-রকম হয়, আমি বুঝতে পারি। কী করে পারি তা জানি না। সঙ্গের ছেলেটির মুখের সঙ্গে ভোলানাথের কোনও মিল নেই, কিন্তু এ যে ভোলানাথেরই সন্তান তাতেও কোনও সন্দেহ নেই। এত দিনে ভোলানাথের অতীত আমাদের কাছে সশরীরে উপস্থিত হয়েছে।

মহিলাটির বয়েস বছর তিরিশেক হবে, সাদামাটা চেহারা, তবে মুখে কোনও অলঙ্কার নেই, শুধু সিঁথিতে সিঁদূরের রেখা।

প্রথমে এক-দেড় মিনিট মহিলাটি কোনও কথাই বলতে পারলেন না। মুখ নিচু করে রইলেন। ছেলেটি ঘাড় ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেয়ালের ছবিগুলো দেখছে।

নিলয়দা তৃতীয় বার জিজ্ঞেস করল, আপনি আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন, কী ব্যাপার, বলুন?

মহিলাটি মাথা তুললেন, ঠোঁট কাঁপছে। আস্তে আস্তে বললেন, আমাদের পৌঁছতে অনেক রাত হয়ে গেল... ট্রেন খুব লেট... অনেক অসুবিধে করলাম আপনাদের।

রূপাবউদি বলল, না না, অসুবিধে কিছু নেই, আপনি কী বলতে এসেছেন, বলুন?

মহিলাটি হাতব্যাগ খুলে তার মধ্য থেকে একটা পুরোনো কাগজের কাটিং বার করে বললেন, ইনি আমার স্বামী।

সব চেয়ে বেশি অবাক হল রূপাবউদি। আমি তো আগে থেকেই জানি, নিলয়দার দিকে তাকিয়ে দেখলাম তার মুখখানা ফ্যাকাসে হয়ে গেছে, যেন তার নামে কেউ চুরির অপবাদ দিয়েছে এইমাত্র।

রপাবউদি কাগজের কাটিংটা দেখে বলল, আপনার স্বামী? এই বিজ্ঞাপন তো আমরা দিয়েছিলাম একমাস আগে, কিংবা তারও বেশি হবে। এত দিন আসেননি কেন?

মহিলা বললেন, আমরা অনেক দূরে থাকি, সেখানে খবরের কাগজ যায় না। আমরা থাকি চাসনালায়, ঝরিয়া থেকে অনেকটা যেতে হয়।

চাসনালা নামটা আমার চেনা। কয়েক বছর আগে সেখানকার খনিতে এক সাংঘাতিক দুর্ঘটনা হয়েছিল, মারা গিয়েছিল প্রায় চারশো শ্রমিক।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, চাসনালা কয়লাখনিতে থাকেন?

মহিলা বললেন, হ্যাঁ। আমরা তো কাগজ পড়ি না। গতকাল একটা চিঠি এলো আমার নামে, চিঠি মানে আর কিছু লেখা ছিল না, খামের মধ্যে শুধু এই কাগজটা ছিল।

আপনাকে এত দিন বাদে কেউ এটা ডাকে পাঠিয়েছে? কে পাঠিয়েছে?

তা জানিনা। এটা দেখেই আপনাদের কাছে চলে এসেছি। সকালের ট্রেন ধরতে পারিনি, কলকাতা শহর ভাল চিনি না, অনেক খুঁজতে হয়েছে এই ঠিকানা।

কয়েক মুহূর্ত নিলয়দা রূপাবউদির সঙ্গে নির্বাক ভাবে দৃষ্টি বিনিময় করলাম। নিলয়দা বিমর্ষ হয়ে গেছে একেবারে।

মহিলা আমাদের বিশেষ কারুর দিকে না তাকিয়ে মৃদু স্বরে জিজ্ঞেস করলেন, উনি কি ভাল আছেন? কাগজে ছবি বেরিয়েছে দেখে মনে হল, তাহলে নিশ্চয়ই ভাল হয়ে গেছেন।

আমাকে আর নিলয়দাকে চুপ করে থাকতে দেখে রূপাবউদিই বলল, না, উনি ভাল হননি এখনও। আপনারা ঝরিয়ায় থাকেন, উনি কলকাতায় এলেন কী করে?

তা তো জানি না। কলকাতায় যে এসেছেন, তা-ও জানতাম না। প্রায় দু'বছর ধরে ওঁর কোনও খোঁজ পাইনি। পুলিশে খবর দেয়া হয়েছিল। পুলিশ কিছু বলতে পারেনি।

এবারে আমি জিজ্ঞেস করলাম, উনি চাসনালাতেই থাকতেন? ওখানে কী করেন?

চাকরি করতেন।

ওঁর এই, ইয়ে... অসুখটা কবে থেকে হল?

চাসনালায় সেই যেবার জল ঢুকে গেল, অনেক লোক ভেতরে আটকা পড়েছিল, সেই সময় থেকেই।

আপনার স্বামী কি সেই সময় খনির মধ্যে আটকা পড়েছিলেন?

না। উনি তো কাজ করতেন অফিসে। টাইমকিপারের কাজ করতেন। অনেক ডেডবডি তোলা হয়েছিল ওপরে, আগুন জ্বেলে পোড়ানো হয়েছিল, তখন খুব খাটতে হয়েছিল তো, লেবারারদের বউরা কমপেনসেশান পেল, তারা সবলাইন দিয়ে দাঁড়াত, উনি তাদের নাম লিখে টিপসই নিতেন। সেই সময়েই রোজ বাড়ি এসে বলতেন, আমার আর কাজ করতে ইচ্ছে করেনা।

টপটপ করে জলের ফোঁটা পড়তে লাগল মাটিতে। ভদ্রমহিলা চোখ মুছবার চেষ্টাও করলেন না। একই রকম গলায় বলে যেতে লাগলেন, অনেক লোক তখন টাকা চুরি করেছিল, ওই সব বিধবা মেয়েগুলোকে বিয়ে করবার জন্য অনেক লোক ব্যস্ত হয়ে

উঠেছিল, আপনার সেসব জানেন বোধহয়? আমার স্বামী ভাল লোক ছিলেন, উনি এত সব সহ্য করতে পারলেন না, প্রথমে খুব মাথায় যন্ত্রণার কথা বলতেন। ঝরিয়া হাসপাতালে ভর্তি করে দেওয়া হয়েছিল।

নিলয়দা এতক্ষণ বাদে জিজ্ঞেস করল, ওঁর, মানে আপনার স্বামীর নাম কী?

মহিলা তাকালেন তার ছেলের দিকে। ছেলেটি বলল, আমার বাবার নাম অনুতোষ বড়াল।

নাম শুনলেই একটা চেহারার ছবি চোখে ভেসে ওঠে। অনুতোষ শুনলে মনে হয়, রোগা, লম্বা, লাজুকমতো একজন মানুষ, আমাদের ভোলানাথের সঙ্গে মেলে না একেবারেই। শ্মশানবাসী, ছাই ভস্মমাখা শিবের নামেই ওকে মানায়।

ভদ্রমহিলা হাতব্যাগ খুলে একটা ফটোগ্রাফ বার করলেন। সাত-আট জনের একটা গ্রুপ ছবি। তার মধ্যে ডান পাশের লোকটির দিকে আঙুল দেখালেন ভদ্রমহিলা। তখন বেশ রোগাই ছিল, তবে এই লোকটিই যে আমাদের ভোলানাথ, তাতে কোনও সন্দেহই নেই।

রূপাবউদি বলল, আপনি বড্ড দেরি করে ফেললেন, উনি তো এখন এখানে থাকেন না। আবার কোথায় চলে গেছেন।

তার পরেই রূপাবউদি ছেলেটির দিকে ফিরে বললেন, তোমার নাম কী?

ছেলেটি বললো, সুখময় বড়াল।

রূপাবউদি বলল, সুখময়, তোমাকে তো দেখে মনে হচ্ছে খাওয়া হয়নি। এসো, খেয়ে নেবে এসো।

ছেলেটি লজ্জা পেয়ে মায়ের দিকে তাকাচ্ছিল, রূপাবউদিতা র হাত ধরে নিয়ে গেলেন ভেতরে।

ভদ্রমহিলা নীরবে কাঁদতে লাগলেন, আমি আর নিলয়দা চুপ করে বসে রইলাম। নিলয়দার মুখ দেখেই বোঝা যায়, ওর মনের মধ্যে একটা ঝড় বইছে। আমার মনের মধ্যেও কিছু একটা হচ্ছে। কিন্তু সেটা ঝড় কি না জানি না।

নিস্তব্ধতা ভাঙলাম আমিই। কারণ আমার পুরো কাহিনিটি জানতে ইচ্ছে করছিল। চাসনালা কোলিয়ারির টাইমবাবু, ভয়াবহ একটা দূর্ঘটনার পর মৃতদেহ আর বিধবা মেয়েদের দেখে পাগল হয়ে গেল, তখন তাকে ভর্তি করা হল ঝরিয়া হাসপাতালে, তারপর?

আমার প্রশ্ন শুনে মহিলা বললেন, হাসপাতালের লোকেরা ওঁকে মারত। সবাই ভাবে মারলেই বুঝি পাগল ভাল হয়। মার খেয়ে খেয়ে উনি দু'বার পালিয়েছিলেন। দু'বারই খুঁজে পাওয়া গিয়েছিল অতিকষ্টে। তার পরের বার আর পাওয়া গেল না। আমি আর কত খুঁজব। আমার এক মামা ছাড়া কেউ নেই, ওঁরও বাবা নেই, ভাই-টাই নেই।

আপনি তার পরও চাসনালাতেই থেকে গেলেন?

কোম্পানি আমাকে একটা ওখানে চাকরি দিয়েছে, আমি আর কোথায় যাব?

রূপাবউদি ফিরে এসে মহিলাকে জিজ্ঞেস করল, আপনি কলকাতায় থাকবেন কোথায়? কেউ আছে?

মহিলা উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, হ্যাঁ, ব্যারাকপুরে আমার মামা থাকেন। খোকাকে ডেকে দিন, এবার যাব।

এত রাত্রে ব্যারাকপুরে যাবেন? কী করে যাবেন?

সে কোনও অসুবিধে হবে না। শিয়ালদা থেকে ট্রেন যায়, আমি গেছি অনেকবার। বিয়ের আগে তো আমি ব্যারাকপুরেই থাকতুম।

আজ আর সেখানে যাবার দরকার নেই। আজ আমাদের এখানেই থাকুন। আজ আমার ছেলের জন্মদিন, আপনি এসে পড়েছেন, আজ আপনাকে যেতে দেব না।

নিলয়দা বলল, একটা কথা জিজ্ঞেস করব? মাধুরী কে? আপনার নাম কি মাধুরী?

ভদ্রমহিলা স্পষ্টতই কেঁপে উঠলেন। চোখ দুটো বিস্ফারিত হয়ে গেল। নিলয়দার দিকে কয়েক মুহূর্ত সেইভাবে তাকিয়ে থেকে বললেন, মাধুরী? জানি না তো? আমার নাম পূর্ণিমা। হঠাৎ একথা জিজ্ঞেস করলেন?

ওই নামটা ওর মুখে অনেক বার শুনেছি।

আমি তো কখনও শুনিনি।

আমার মনে হল, ভদ্রমহিলা বোধহয় কিছু একটা গোপন করে যাচ্ছেন। মাধুরী নামটা কি সত্যিই উনি আগে শোনেননি? মাধুরী রক্ত-মাংসের কেউ নয়। কয়লা খনির এক টাইমবাবুর পক্ষে কি এতখানি বিমূর্ত কল্পনা সম্ভব? কিংবা যারা পাগল হয়, তারা সকলেই উচ্চমার্গের চিন্তা করে?

নিলয়দা বলল, মাথার গোলমাল হবার পর উনি আপনার ওপর কখনো, ইয়ে, মানে, রেগে মারতে-টারতে গিয়েছেন?

না, কক্ষনও না। উনি শান্ত মানুষ ছিলেন। কোনও দিন অফিস কামাই করতেন না। ঝড়-বৃষ্টি, অসুখ-বিসুখ হলেও অফিসে যাওয়া চাই-ই। সব সময় বলতেন, চাকরি গেলে তোমাদের অসুবিধে হবে।

বাইরে একটা গাড়ি দাঁড়াল। জয় আর স্বর্ণ এসে গেছে। রূপাবউদি বলল, এসো আগে খেয়ে নেওয়া যাক।

নিলয়দা বলল, খাবার গরম করতে বলো, এক্ষুনি আসছি। নীলু, একটু শোন তো।

আমরা দুজনে বাড়ির বাইরে বেরিয়ে রাস্তায় দাঁড়ালাম। দুজনে দুটো সিগারেট ধরাবার পর একটু সময় নিয়ে নিলয়দা জিজ্ঞেস করল, এবার কী হবে?

নিরুত্তর। এর আগে আর কখনও আমি পরামর্শদাতার ভূমিকা নিইনি। নিলয়দার মানসিক সঙ্কটটা আমি বুঝতে পারছি, কিন্তু আমি ওকে কোন বুদ্ধি দেব? আমার বুদ্ধির দৌড় শেষ।

নিলয়দা আবার বলল, ভদ্রমহিলা যখন জিজ্ঞেস করবেন যে, ওঁর স্বামী এখান থেকে কোথায় গেল, তখন কী উত্তর দেব?

আমি বললাম, রূপবউদি তো উত্তর দিয়েই দিয়েছে। সে এখান থেকে চলে গেছে। কথাটা মিথ্যেও নয়।

এখান থেকে চলে যায়নি, আমরা তাকে এক জায়গায় ছেড়ে দিয়ে এসেছি।

প্রায় একই কথা। সে নিজেই চলে যেতে পারত। পাগল মানুষ, যে-কোনও দিন সে আবার হারিয়ে যেতে পারত।

পারত, কিন্তু যায়নি। সে কোথায় আছে, আমরা জানি। সেটা গোপন করে যাওয়া অন্যায় নয়?

আমি প্রমাদ গুনলাম। অনুতোষ ওরফে ভোলানাথ ঠিক কোথায় আছে, তা কি সত্যি আমরা জানি? জঙ্গলের মধ্যে সেই জায়গাটা আমরা আবার খুঁজে বার করতে পারব? তাছাড়া তাকে জঙ্গলের মধ্যে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে, সে কথা স্বীকার করা কি ঠিক হবে? কুকুর-বেড়াল তো নয়, মানুষ। হয়তো আমরা ঘোরতর বে-আইনি কাজ করেছি। মানুষের না খেতে পেয়ে মরা বে-আইনি নয়, কিন্তু একজন ক্ষুধার্ত মানুষ যদি অন্য কারুর কাছ থেকে জোর করে খাবার কেড়ে নেয় তবে তা বে-আইনি।

আমরা ঝোঁকের মাথায়, অনেকটা নিরুপায় হয়েই একটা কাজ করে ফেলেছি। এখন কি তার জন্য জেল খাটতে হবে? তা মন্দ কী। কিছু দিন জেলেই ঘুরে আসা যাক। সরকার

ভোলানাথকে ছেড়ে দিয়েছে, কিন্তু ভোলানাথের প্রতি অবিচার করেছি বলে আমাদের জেলে দিতে নিশ্চয়ই সরকার দ্বিধা করবে না।

নিলয়দা বলল, তুই চুপ করে রইলি যে? ওকে ফিরিয়ে আনা এখন আমাদের ডিউটি।

ফিরিয়ে আনার পর? রাখবে কোথায়?

ভোলানাথ কোল ইন্ডিয়ার কর্মচারী ছিল, এখন বোধহয় ওর চাকরি আছে। কোল ইন্ডিয়া ওর চিকিৎসার দায়িত্ব নেবে। ভোলানাথকে নিয়ে কী করা উচিত, তা ওর স্ত্রী বুঝবে! ইচ্ছে করলে এখন আমরাই তো ওকে যে-কোনও হাসপাতালে ভর্তি করে দিতে পারি, ওর স্ত্রী ফর্মে সই করবে।

কেন যেন আমার মনটা ভারি ভারি লাগছে, নিলয়দার কথায় কোনও উৎসাহ বোধ করলাম না। কিছু একটা বড় রকমের ভুল হয়ে যাচ্ছে, আমরা ধরতে পারছি না।

রূপাবউদির ডাক শুনে আমরা ভেতরে এলাম। স্বর্ণ আর জয় পূর্ণিমা বড়ালকে ঘিরে দাঁড়িয়ে নানা প্রশ্ন করছে। রূপাবউদি বলল, আমি এঁকে বলেছি, তোমরা এঁর স্বামীর সঙ্গে ঝাড়গ্রাম বেড়াতে গিয়েছিলে, তারপর উনি সেখানেই থেকে গেছেন। তোমরা তাকে ফিরিয়ে এনে দেবে।

ভোলানাথের ছেলে সুখময় তার বড় বড় টলটলে চোখ মেলে একবার তার মায়ের দিকে, আর একবার রূপাবউদির দিকে তাকাচ্ছে। স্বামীবঞ্চিতা এক রমণী আর একটি শিশু, এদের দেখার পরই পালটে গেছে সকলের মনের ভাব।

পূর্ণিমা আর তার ছেলে পরদিনও রয়ে গেল নিলয়দার বাড়িতে। মাত্র তিন দিনের ছুটি নিয়ে এসেছেন বলে পূর্ণিমার পক্ষে আর থাকা সম্ভব নয়। নিলয়দা আর রূপাবউদি ওদের পৌঁছে দিয়ে এল হাওড়া স্টেশনে। রূপাবউদির সঙ্গে পূর্ণিমার এত ভাব হয়ে গেছে যে, রূপাবউদি কথা আদায় করে নিয়েছে, পূর্ণিমা এরপর কলকাতায় এলেই তাদের বাড়িতে

উঠবে। নিলয়দাও কথা দিয়েছে, কয়েক দিনের মধ্যেই সে পুর্ণিমার স্বামীকে পৌঁছে দেবে চাসনালায়।

আমি কয়েক দিন আর যাইনিও বাড়িতে। শুক্রবার রাত্তিরে নিলয়দা এসে আমাকে ধরল। সব ব্যবস্থা হয়ে গেছে। ড. ভড়ের সঙ্গে পরামর্শ করে এসেছে নিলয়দা। কোল ইন্ডিয়ার কর্মচারি হলে রাঁচির হাসপাতালে ভর্তি করতে কোনও অসুবিধেই হবে না। রাস্তার পাগল নয়, এখন ওর পরিচয় পাওয়া গেছে, মোটামুটি মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে পড়ে, এবার একটা ব্যবস্থা হবেই।

নিলয়দা বলল, কাল ভোরেই তো তাহলে রওনা হতে হয়। কাল শনিবার আছে, স্বর্ণ আর জয়ও সঙ্গে যাবে বলছে।

আমি কাচুমাচু ভাবে বললাম, নিলয়দা, কালকে যে আমার একটা চাকরির ইন্টাভিউ আছে। আমি তো যেতে পারছি না।

নিলয়দা বলল, শনিবার ইন্টারভিউ? কোন অফিসে?

আছে এক জায়গায়। এক জন লোক আমাকে দেখা করতে বলেছে, ঠিক আমার মত এক জনকেই খুঁজছে নাকি।

তুই আমার কাছে মিথ্যে কথা বলছিস নীলু? তোকে বাদ দিয়ে আমরা যাব কী করে?

ঝাড়গ্রাম থেকে এক জন ড্রাইভার নিতে পারো। ওরা সব রাস্তা চেনে।

তুই যাবিনা? এত দিন আমরা দু'জনে সব ব্যাপারে এক সঙ্গে ছিলাম, তুই কেন যেতে চাইছিস না বল তো?

আমার সত্যিকাজ আছে, নিলয়দা!

নিলয়দা বেশি পেড়াপেড়ি করেনা কক্ষনও। বিষণ্ণ ভাবে বলল, তাহলে আর তোকে জোর করব না। আমি কালকেই বেরিয়ে পড়ছি, আর দেরি করা যায় না।

নিলয়দাকে রাস্তা পর্যন্ত এগিয়ে দিতে এলাম, কিন্তু আর একটিও কথা হল না।

সারা রাত ঘুমোত পারলাম না ভাল করে। ছটফট করলাম বিছানায়। কীসের অস্বস্তি বুঝতে পারছি না। ঘুমের অসুবিধে আমার হয় না সাধারণত। কোনও দুঃস্বপ্নও দেখছি না। একটু তন্দ্রা আসছে, আবার ভেঙে যাচ্ছে।

ভোরের আলো ফোটার সঙ্গে সঙ্গে আমি এসে দাঁড়ালাম বারান্দায়। ভোরের ঠাণ্ডা বাতাস আজ অনুপস্থিত, রাত্তিরেও খুব গরম ছিল। মনে পড়ল, অনেক দিন সমুদ্রের ধারে যাইনি। এখন যে কোনও সমুদ্রতীরে হাওয়ারা লুটোপুটি খাচ্ছে। এবার যেতে হবে।

দূর থেকে একটা জিপ গাড়ি এসে থামল আমাদের বাড়ির সামনে। স্বর্ণ, জয় আর নিলয়দা নামল গাড়ি থেকে স্বর্ণ হাতছানি দিয়ে আমাকে হুকুমের সুরে বলল, এই, নেমে এসো।

আমার খালি গা বলে আমি চট করে বারান্দা থেকে সরে এসে একটা জামা গলিয়ে নিয়ে নেমে এলাম। নিলয়দা বলল, আমি আসতে চাইনি রে, ওরা জোর করে এখানে টেনে আনল।

স্বর্ণবলল, খালি পা কেন? চটি পরে এসো। পাজামার সঙ্গে শার্ট? বিচ্ছিরি দেখায়! একটা পাঞ্জাবি পরে আসবে।

আমি তো যাচ্ছি না।

যাচ্ছ না মানে? বারান্দায় দাঁড়িয়েছিলে কেন? তৈরি হয়ে নিতে পারোনি?

জয় বলল, চলুন, চলুন বেশি দেরি করলে হাওড়ায় জ্যাম হবে।

বেশিবার না না করলে মনে হয় দাম বাড়াচ্ছি। স্বর্ণ কোনও কথাই শুনবেনা। ঘুমন্ত মায়ের কানে বার্তাটি জানিয়ে ঠিক বারো মিনিটের মধ্যে আমি তৈরি হয়ে ফিরে এসে জিপে উঠলাম। আমি নিলয়দার পাশে, ওরা দুই প্রেমিক-প্রেমিকা পেছনে। জয়ের অনেক চেনাশুনো আছে, সে কাঁকড়াঝোড় বাংলোর রিজার্ভেশন করিয়ে ফেলেছে পর্যন্ত।

আগের বারের যাওয়ার এবারের যাওয়ায় অনেক তফাৎ। আমি কিছুতেই জড়তা কাটিয়ে উঠতে পারিছনা মনের মধ্যে। যেন মেঘ জমাট হয়ে আছে, কোনও তরঙ্গ উঠছে না। জয় আর স্বর্ণর ঠিক পিকনিকের মেজাজ। মাঝে মাঝে গান গেয়ে উঠছে দুজনে। আমার প্রতি জয়ের ব্যবহার বেশ স্বচ্ছল। ও কি জানে, স্বর্ণ আমার সঙ্গে এক দিন গঙ্গায় নৌকো চড়ে বেড়াতে গিয়েছিল?

প্ল্যান ছিল একটানা গাড়ি চালিয়ে ঝাড়গ্রামে এসে বিশ্রাম নেওয়া হবে। কিন্ত লোধাশূলিতে একটা চাকা পাঙ্কচার হল, চাকা বদলাতে সময় চলে গেল কিছুটা। ঝাড়গ্রামে এসে খাওয়া-দাওয়া সেরে নিলাম। তারপর আবার যাত্রা।

দহিজুড়িতে আজও হাট জমেছে। একটা মোষের গাড়ির পেছনে পড়ায় আস্তে আস্তে গাড়ি চালাচ্ছে নিলয়দা, একটি আদিবাসী রমণী আমাদের পাশে এসে বলল, ও বাবু, আন্ডা নেবে?

নিলয়দা আমার দিকে তাকিয়ে হাসল।

জয় বলল, একটা বিচ্ছিরি গন্ধ পাচ্ছস্বর্ণ? এইসব হাটফাটের পাশ দিয়ে গেলেই এই রকম গন্ধ পাওয়া যায়। এরা পচাই আর তাড়ি-টাড়ি কী সব বিক্রি করে।

আমি অবাক হয়ে জয়ের দিকে তাকালাম। কোথায় বিচ্ছিরি গন্ধ? সতেজ তরিতরকারি, টাটকা বাতাস, এই গন্ধটা জয়ের খারাপ লাগল? মনে হচ্ছে যেন আজও একটা পাগলকে সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছি।

বেলপাহাড়ি ছাড়িয়ে জঙ্গলে ঢোকার মুখে আমি একবার বলে উঠলাম, নিলয়দা।

মুখ ফিরিয়ে নিলয়দা বলল কী?

আমি ইতস্তত করে বললাম, কিছুনা।

স্বর্ণ জিজ্ঞেস করল, এই জঙ্গলে ময়ুর আছে? আমরা একবার বেতলা ফরেস্টে গিয়ে অনেক ময়ুর দেখেছিলাম, তোমার মনে আছে নিলয়দা? তোমাদের বিয়ের ঠিক পরেই।

নিলয়দা বলল, তুমি তখন ছোট ছিলে! এই জঙ্গলের কথা নীলু ভাল জানে! ওকে জিজ্ঞেস করো।

স্বর্ণ বলল, ও তো সারাক্ষণ গোমড়ামুখো হয়ে আছে। কথাই বলছে না। নীলকমল, তোমার কী হয়েছে বলো তো?

আমি ভদ্রতা করে হাসলাম। আমার সত্যিই কষ্ট হচ্ছে। একটা স্বপ্ন ভেঙে যাওয়ার কষ্ট। ঝরনার পাশে শুয়ে আছে একটি মানুষ, মাথার ওপরে আকাশ, তার গায়ে লাগছে নাম-না-জানা গাছের স্নেহ বাতাস, পাখিরা তার দিকে অবাক চোখে দেখে। তার কোনও অতীত নেই, ভবিষ্যৎ নেই, খিদে পেলে সে খাদ্যের সন্ধানে যাবে অথবা যাবেনা। কারুর তাড়না সহ্য করতে হবে না তাকে, সাত্যকি বসুমল্লিকের মতো কেউ দয়া দেখাতে আসবে না। তার সঙ্গী শুধু তার নিজের মন।

আমি এ-রকম পারিনি, কখনও পারব না। আর বেশি দিন চাকরি-বাকরি না পেলে আমায় শেষ পর্যন্ত সাত্যকি বসুমল্লিকের কাছেই যেতে হবে। গিয়ে বলব, এই যে এসেছি স্যার, মাথা পেতে দিচ্ছি, আপনি আমার ঘিলু বার করে নিন।

এক জন কেউ সম্পূর্ণ স্বাধীন হতে পেরেছিল, তাকে আমরা ফিরিয়ে নিয়ে বন্দি করতে চাইছি। পাগলের চিকিৎসা মানে কী? একটা ছোট ঘরে আটকে রাখবে তাকে, হয়তো হাতে-পায়ে শিকল পরাবে, ইলেকট্রিক শক্ দেবে, সে একটু চ্যাঁচামেচি করলে

ওয়ার্ডবয়রা এসে হাঁটু দিয়ে চেপে ধরবে তার বুক। কয়লাখনির এক টাইমবাবু তার বাঁধা ধরা সময়ের সব জাল ছিঁড়ে বেরিয়ে এসেছিল, সে দেখেছিল অকারণ নির্বোধ মৃত্যু, সে দেখেছিল টিপসই দিয়ে খেসারতের টাকা নিতে আসা স্ত্রীলোকদের হাত, এরই মধ্যে সে দেখেছিল লোভ ও রিরংসা, তাই সে তার পুরনো সবকিছু, এমনকী মনটাকেও বিসর্জন দিয়ে চলে এসেছিল। আবার তাকে আমরা সেইখানেই ফিরিয়ে দিতে চাইছি।

ওইসব আসুরিক চিকিৎসার পর ভোলানাথ যদি কোন দিন সুস্থ হয়ে ওঠে? আবার তাকে যেতে হবে তার অফিসের বড়বাবুর কাছে, সেখানে হাঁটু গেড়ে বসে সে বলবে, এই যে, মাথা পেতে দিয়েছি, আমার ঘিলুটা বার করে নিন স্যার, আমাকে একটা যন্ত্র বানিয়ে ফেলুন।

অকস্মাৎ যেন ছায়াছবির মতো দেখতে পেলাম, লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি টাইমবাবু বসে আছে অফিসে, কলে-কারখানায়। মাথা হেঁট করে সবাই ফিস ফিস করে বলছে, ঘিলু বার করে নিন, ঘিলু বার করে নিন, নইলে পাগল হয়ে যাব।

নদীটা পার হবার সময় আমাদের তিন জনকে নামতে হল গাড়ি থেকে। গাড়ি ঠেলার চেয়ে জল নিয়ে খেলা করাতেই জয় আর স্বর্ণর বেশি উৎসাহ। একবার আছাড় খেয়ে পড়ে গিয়ে জয় তার জামা টামা ভিজিয়ে ফেলল। স্বর্ণর উচ্ছল হাসিতে কেঁপে উঠল বনভূমি।

নদীর ওপারে উঠে নিলয়দা নিজেই বলল, এবারে ডান দিকে না?

দিনের আলোয় জঙ্গলে কোনও রোমাঞ্চ নেই। আজ এই জঙ্গলটাকে তেমন গভীরও মনে হচ্ছে না। নিস্তব্ধতারও কোনও প্রগাঢ় রূপ নেই। মেঘশূন্য আকাশে গনগনে রোদ। এই সবকিছুর মধ্যেও ভাল লাগাবার উপকরণ খুঁজে নেওয়া যায়, যদি মনটা সে-রকম উন্মুক্ত থাকে।

কয়েক বার রাস্তা ভুল করে আমার পেয়ে গেলাম সেই ঝরনাটা। ঝরনা কোথায়? এ তো একটা নালা! সেই রাত্রে কী অপরূপ মনে হয়েছিল, কিন্তু এখন দেখছি বেশ ময়লা জল। জিপ থেকে নেমেই আমরা সবাই ছুটে গেলাম ঢালুর দিকে। ভোলানাথ সেখানে নেই।

পলিথিনের ব্যাগ দুটো পড়ে আছে গাছতলায়। একটা ব্যাগে কিছু বাদাম এখনও রয়ে গেছে। ব্যাগটা ফুটো ফুটো, বোধহয় পাখিরা ঠুকরে ঠুকরে বাদাম খাওয়ার চেষ্টা করেছে। দুটো সিগারেটের প্যাকেট পড়ে আছে না খোলা অবস্থায়। এক জায়গায় পাওয়া গেল বিস্কুটের টিনটা, এতেও কিছু বিস্কুট রয়ে গেছে। ভোলানাথের কোনও চিহ্ন নেই ধারেকাছে।

নিলয়দা চিৎকার করে ডাকল, ভোলানাথ! ভোলা-না-থা! অনু-তোষ!

যেন স্পষ্ট প্রতিধ্বনি, সেইডাক ঘুরতে লাগল বনের মধ্যে। আমার মনের মধ্যে বরফ গলছে, আমার মনে হচ্ছে ভোলানাথকে পাওয়া যাবেনা।

খানিকটা খোঁজাখুঁজি করতেই সেই নালাটার এক জায়গায় দেখা গেল একটা জামা আটকে আছে পাথরে। এটা নিলয়দারই পাঞ্জাবি, ভোলানাথের গায়ে ছিল। জামা সে ইচ্ছে করে খুলে ফেলতেই পারে। জঙ্গলে জামার তো কোনও দরকার নেই।

রাস্তার পাগলেরও একটা ছোটখাটো সংসার থাকে। সে-ও কিছু কিছু জিনিস জমায়। ছেঁড়া কম্বল, ভাঙা বা তোবড়ানো থালা, বাটি, আধপোড়া সিগারেট। এখানে সেরকম কোনও কিছুই দেখা যাচ্ছে না। এই কদিনে অনেকবার বৃষ্টি হয়েছে। গাছের ডালপালা ভেঙে ভোলানাথ একটা ঝুপড়ি বানিয়ে নিতে পারত, সেরকম কিছু চেষ্টাও সে করেনি।

দু’ ঘণ্টা ধরে তন্নতন্ন করে খুঁজে আমরা ক্লান্ত হয়ে পড়লাম। বিকেল গাঢ় হয়ে আসছে, এরপর আর কিছুই দেখা যাবেনা। স্বর্ণ বলল, চলল আমরা ডাকবাংলোতে যাই।

সন্ধে হতে না-হতেই একটা মস্ত চাঁদ উঠল আকাশে। ডাকবাংলোর পেছন দিকে একটা ছোট টিলা, সেখানে চেয়ার পেতে দিয়েছে আমাদের। যারা বেড়াতে আসে, তারা সবাই এখানে এসে বসে। এখান থেকে অনেকটা দূর পর্যন্ত দেখা যায়। বাংলোর সামনে বেশ কিছু লোকজন জড়ো হয় সন্ধেবেলা, কাছেই আছে একটা মুদির দোকান। ফরেস্ট গার্ড আর চৌকিদারকে অনেক প্রশ্ন করেছে নিলয়দা। না, তারা কেউ জঙ্গলের মধ্যে কোনও নতুন মানুষকে দেখেনি। ফরেস্ট গার্ড জোর দিয়ে বলল, নতুন লোক এলে সে ঠিক জানতে পারত, সাইকেলে সে সারা বন টহল দিয়ে বেড়ায়।

নিলয়দা এখানে ওদের সঙ্গে কথা বলতেই ব্যস্ত। কাল সকালে আর একটা সার্চ-পার্টি বেরুবে। জয় আর স্বর্ণ হাত ধরাধরি করে মিলিয়ে গেল অন্ধকারে। আমি চুপচাপ একলা বসে রইলাম। চতুর্দিকে ঝিঁঝির ডাক, দূরে শোনা যাচ্ছে মাদলের শব্দ, শব্দটা সরে সরে যাচ্ছে, কোনও একটা দল মাদল বাজাতে বাজাতে যাচ্ছে বনের পথ দিয়ে। এরই মাঝখানে যেন আমি আবার শুনতে পেলাম, নিলয়দার সেই ব্যাকুল ডাক, ভোলা না-থ। ভোলা-না-থ! অনু-তোষ!

কেউ সেই ডাকে সাড়া দেবে না। অনুতোষ নামে কেউ নেই। ভোলানাথ নামেও কেউ নেই। জঙ্গলের মধ্যে যাকে আমরা রেখে গিয়েছিলাম, সে একজন অন্য মানুষ। সে ইচ্ছে মতো চলে গেছে গভীর, গভীরতর বনে। সমুদ্র যেমন অতল সেই রকম সব অরণ্যই অসীম। ইচ্ছে করলেই হারিয়ে যাওয়া যায়।

শেষবার ভোলানাথ আমাকে বলেছিল, আমিও থাকব না, তুমিও থাকবেনা, কেউ থাকবে না। উপনিষদের ঋষিদের মতো অতি সরল অমোঘ কথা। ভোলানাথ নেই, আমরাও থাকবনা।

হঠাৎ যেন মনে হল, আজ থেকে কয়েক বছর বাদে, ঠিক এই জায়গাটাই, এই চেয়ারে আর এক জন মানুষ বসে আছে। অনেকটা আমারই মতো চেহারা, আমারই মতো হাতের মুঠোয় সিগারেট ধরে সে টানছে, কিন্তু সে আমি নয়। অন্য কেউ। আমি তখন কোথাও

নেই। আর এক জন নিলয়দা আর একজন ভোলানাথকে ব্যাকুলভাবে ডাকবে। কিন্তু তাকেও পাবেনা। সেই আর একজন ভোলানাথ টাইমবাবু হতে অস্বীকার করে, জীবনের ধরাবাঁধা হিসেব অসমাপ্ত রেখে নিজের মনকে সঙ্গী করে কোথাও হারিয়ে যাবে।